শারদ স্মরণিকা – ২০২৫
প্রতিবিম্ব
মডার্ণ ক্লাব
ভট্টপুকুর, আগরতলা

With Best Compliments from :

CHOWDHURY MARBLES

Suryamaninagar
Near TRIPURA UNIVERSITY
799130

নবনির্মিত মডার্ণ ক্লাব

প্রতিবিম্ব - ২০২৫

(১৪৩২ বঙ্গাব্দ)

মডার্ণ ক্লাব

নাগেরজলা ● ভট্টপুকুর ● আগরতলা ● ত্রিপুরা (পশ্চিম)

"Pratibimba"

Saradiya Souvenir - 2025

Modern Club

Bhattapukur, Agartala, Tripura (West)

Ph : 9436482221

'প্রতিবিম্ব'

স্মরণিকা কমিটি - ২০২৫

সম্পাদক

শ্রী পার্থ সারথি দেব

উপদেষ্টা —

শ্রী শেখর সি দত্ত

শ্রীমতী জবা চৌধুরী

শ্রী বিদ্যুৎ সেন

শ্রী জয়ন্ত পাল

শ্রী নন্দ দুলাল চৌধুরী

সদস্য -

শ্রী দেবব্রত ভৌমিক

শ্রী মিন্টু দেব

শ্রী প্রণব পোদ্দার

শ্রী সুব্রত সাহা

শ্রী কল্লোল পাল

শ্রী ধৃতিমান চক্রবর্তী

শব্দ বিন্যাস ও মুদ্রণে ঃ

এশমিনা প্রিন্টার্স - আগরতলা

প্রচ্ছদ ঃ

অনুপ কুমার আচার্য

মডার্ণ ক্লাবের বর্তমান পরিচালন কমিটি

সভাপতি	: শ্রী সজল চক্রবর্তী
সহ-সভাপতি	: শ্রী সমর রায়
	: শ্রী স্বপন দত্ত
সম্পাদক	: শ্রী সঞ্জিত নাহা (লিটন)
সহ-সম্পাদক	: শ্রী দেবব্রত ভৌমিক
	: শ্রী দেবারুণ দত্ত
কোষাধ্যক্ষ	: শ্রী তপন রক্ষিত
সহ-কোষাধ্যক্ষ	: শ্রী পার্শ্বনাথ ধর
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	: শ্রী আশীষ দেব
সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক	: শ্রী রাণা সাহা
ক্রীড়া সম্পাদক	: শ্রী প্রণব পোদ্দার
প্রচার সম্পাদক	: শ্রী মিন্টু দেব
অফিস সম্পাদক	: শ্রী উত্তম ধর

সদস্য

শ্রী সুবীর দত্ত
শ্রী আশীষ রায়
শ্রী রামকৃষ্ণ বণিক
শ্রী পার্থ চক্রবর্তী
শ্রী বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত
শ্রী চন্দন কর
শ্রী অলক চক্রবর্তী
শ্রী অলক দে
শ্রী বিদ্যুৎ সেন
শ্রী বাপী দত্ত
শ্রী পার্থ সারথি দেব
শ্রী জয়ন্ত ভদ্র
শ্রী নিতাই পাল

উপদেষ্টামণ্ডলী

শ্রী মৃণালকান্তি দেবরায়
শ্রী সুবীর দত্ত
শ্রী হিমাদ্রী সাহা
শ্রী স্বরাজ দেব
শ্রী শেখর সি দত্ত
শ্রী গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী
শ্রী ফণীন্দ্র চক্রবর্তী
শ্রীমতী স্বপ্না দাশগুপ্তা
শ্রী রতন দেব
শ্রী সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী
শ্রী অপু বিশ্বাস
শ্রী গোপাল দত্ত
শ্রী বিদ্যুৎ চৌধুরী
ড. জয়ন্ত পাল
ডা. বাসুদেব রায়
শ্রীমতী শিপ্রা রায়
শ্রীমতী কনিকা চক্রবর্তী
শ্রীমতী গায়েত্রী চক্রবর্তী
শ্রী উত্তম রায়
শ্রী অসীম বিশ্বাস
শ্রী প্রদ্যুৎ সেন
ডা: মণিদীপ চক্রবর্তী
শ্রী পান্নালাল চক্রবর্তী
শ্রী সন্তোষ ঘোষ
শ্রীমতী মিতা চক্রবর্তী
শ্রী সুব্রত ভৌমিক

ক্লাবের দুর্গা পূজা কমিটি — ২০২৫

সভাপতি -	শ্রী বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত
সহ সভাপতি -	শ্রী স্বরূপ চক্রবর্তী
	শ্রী অসীম বিশ্বাস
সম্পাদক -	শ্রী আশীষ দেব
সহ সম্পাদক -	শ্রী নিতাই পাল
	শ্রী ধৃতিমান চক্রবর্তী
কোষাধ্যক্ষ -	শ্রী চন্দন কর
সহ কোষাধ্যক্ষ -	শ্রী দেবারুন দত্ত

সদস্য—

শ্রী শেখর ভট্টাচার্য
শ্রী উত্তম রায়
শ্রী তপন সেন
শ্রী শ্যামল সেন
শ্রী অলক চক্রবর্তী
শ্রী অলক দে
শ্রী শ্যামল চৌধুরী
শ্রী নেপাল সেন
শ্রী মিন্টু দেব
শ্রী প্রণব পোদ্দার
শ্রী তাপস ভদ্র
শ্রী রবীন্দ্র সরকার
শ্রী জয়ন্ত ভদ্র
শ্রী অনির্বাণ চক্রবর্তী
শ্রী পিনাক চক্রবর্তী
শ্রী কল্লোল পাল
শ্রী রাজু দেবনাথ
শ্রী পার্থ সেন
শ্রী শুভঙ্কর দেব
শ্রী ইন্দ্রজিৎ দাস

সদস্যা—

শ্রীমতী মিতা চক্রবর্তী
শ্রীমতী দেবপ্রিয়া দত্ত
শ্রীমতী রীনা কপালি
শ্রীমতী বেলা দেব
শ্রীমতী শিল্পী মজুমদার ধর
শ্রীমতী রুপা বৈদ্য
শ্রীমতী অদিতি চক্রবর্তী
শ্রীমতী রুমা দে
শ্রীমতী সঞ্চিতা দত্ত
শ্রীমতী জয়া বিশ্বাস
শ্রীমতী অনিতা পাল ভদ্র

উপদেষ্টামণ্ডলী—

শ্রীমতী গায়েত্রী চক্রবর্তী, শ্রীমতী শিপ্রা রায়, শ্রী মৃণাল কান্তি দেবরায়,
শ্রী আশীষ রায়, শ্রী সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী, শ্রী পার্থ চক্রবর্তী, শ্রী দেবজিৎ বিশ্বাস, শ্রী অজয় সাহা
শ্রী গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী, শ্রী পান্নালাল চক্রবর্তী, শ্রী সুব্রত ভৌমিক

সূচীপত্র

:: কবিতা ::

জানালা	— বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী	১৩
নদী জানে	— রাতুল দেববর্মণ	১৩
সন্ধিক্ষণ	— শেখর সি. দত্ত	১৪
'একসাথে'	— সুভাশিষ কর	১৪
সিঁথি	— দিপ্সি দে	১৫
উৎসব	— গোপা চট্টোপাধ্যায়	১৫
– পীযূষ রাউতের দু'টি কবিতা		
কিছুই নয়		১৬
তাকে ডেকে আনা কেন	-	১৬
হাসির আলোয়	— বিষ্ণু শংকর বর্মা	৩০
আক্ষেপ	— ভবানী বিশ্বাস	৩০
"In The Kingdom Of Ghosts"	— Sanjeev Singha	৩১
Deprivity	— Agrata Deb	৩১
ঘ্রাণ	— সুস্মিতা দাস	৩৮
একটুখানি ভেবে দেখো	— প্রগতি চাকমা	৩৮
ওরা জানে না ওরা কী বলছে	— অনিল কুমার নাথ	৩৯
সোনার আংটি	— অগ্রতা দেব	৩৯
জল থৈ থৈ কবিতা	— সংহিতা ভট্টাচার্য	৪০
যুগান্তর	— শেফালী ভৌমিক	৪০
প্রিয় কবি	— ক্র ইরী মগ চৌধুরী	৪১
আগমনী সুর	— পৃথ্বীশ আচার্য	৪১
মায়ের আগমন	— মনচলি চক্রবর্তী	৪১
'ঘুড়ি'	— দীপক রঞ্জন কর	৪৮
সাহসী ছেলে	— ঋষভ চক্রবর্তী	৪৮
ভয়	— প্রদীপ চক্রবর্তী	৪৯
মোবাইল ফোনের ব্যবহার	— রাখী দেব	৪৯
জিজ্ঞাসা	— লীলা চক্রবর্তী	৫৪
আশায়	— মৌসুমী কর	৫৪
দৃষ্টিভ্রম	— শুভদীপ দাশগুপ্ত	৫৫
আগমনী	— জয়ন্তী চৌধুরী	৫৫
'এই ভিড়ের মাঝে'	— শান্তনু রায় বর্মণ	৬৪
সময়ের পদাবলী	— গোবিন্দ ধর	৬৪
স্মৃতি	— শ্রেষ্ঠা দত্ত বণিক	৬৪
মহা কুম্ভ	— ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী	৬৫
স্নিগ্ধ সুবাস	— শাশ্বতী দেব	৬৫

:: প্রবন্ধ ::

বাংলা, বাঙ্গালি, বাংলাভাষা	— মিহির দেব	১৭
রবীন্দ্রনাথ কিতাবে নয়, সবার হৃদয়ে ও কর্মে থাকুক	— সঞ্জীব দে	১৯
স্বাধীন ভারতে সংবাদপত্রে ব্রিটিশ আইন	— সুবল কুমার দে	২৮
আশালতা-নজরুলের পরিণয়	— চিত্রা রায়	৩৬
জীবন বৃত্তান্ত	— পারমিতা দাশ	৪২
ফেলে আসা মেয়েবেলার বিকেল	— সুমিতা দেব	৪৬
'নারী তুমি সব্যসাচী'	— বর্ণালী দাশগুপ্ত	৫২
রামায়ণের রামচন্দ্র কি শূদ্র দলিত বিরোধী ?	— অভিজিত দেব	৫৬
প্রাচীন ত্রিপুরার দুর্গা ও দেবী দুর্গার দু'হাতের রহস্য	— সুব্রত সাহা	৫৮
কামিনী রায় : এক নারীবাদী লেখিকা	— মিঠুন রায়	৬০
ফুলমণি ও করুণার বিবরণ	—পার্বতী দাশগুপ্তা	৬৩
বৈদ্যুতিন বর্জ্যের দ্বারা পরিবেশ দূষণ	— প্রণয় কুমার রায় বর্মণ	৬৮
অন্ধত্ব মানেই অন্ধকার নয় প্রেরণা প্রণব লাল	—পঞ্চানন মণ্ডল	৭১
বেনানা প্রব্লেম	— বিষ্ণু ঠাকুর	৭২

:: গল্প ::

মাটির মর্যাদা	— জহর দেবনাথ	১৮
হ্যালো বেবী	— নির্মল অধিকারী	২২
জানালার ওপারে	— ড. চন্দন সাহা	৩২
সমাজ সেবক	— চন্দন আচার্য	৪৪
শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর	— পারিজাত দত্ত	৫০
সেই অদ্ভুত প্রশ্ন	— সুস্মিতা দেবনাথ	৬৬

:: ভ্রমণ কাহিনি ::

আট দেশের পথে-প্রান্তরে (ইউরোপ ভ্রমণ)	—জবা চৌধুরী	২৪

:: স্বাস্থ্য ::

জলাতঙ্করোধী টিকা নিয়েও মৃত্যু : কেন ?	— সমাধান দে	৭৩
থ্যালাসেমিয়ার গল্প	— ডা.কনক চৌধুরী	৭৪
চিকিৎসা জগতে ফিজিওথেরাপি	— ডা. অনিন্দিতা দে	৭৬

:: খেলা ::

১২৮ বছর পর অলিম্পিকে ক্রিকেট	— পার্থ ভট্টাচার্য	৭৭
ত্রিপুরার অরিত্র এভারেস্টের চূড়ায়	— বিপ্লব চন্দ	৭৮

सत्यमेव जयते

প্রফেসর (ডা:) মানিক সাহা
মুখ্যমন্ত্রী
ত্রিপুরা সরকার

শুভেচ্ছা বার্তা

প্রতি বছরের মত এবছরও আগরতলার ভট্টপুকুরস্থিত মডার্ণ ক্লাবের শারদ স্মরণিকা 'প্রতিবিম্ব' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। উৎসবকে কেন্দ্র করে শিল্প ও সাহিত্যের মেলবন্ধন নিঃসন্দেহে আমাদের ঐতিহ্যকেই সমৃদ্ধ করে।

শারদোৎসবের পরিমণ্ডলের মাধ্যমে গড়ে উঠে সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃবোধ। উৎসব আমাদের জীবনকে আনন্দমুখর ও নতুন বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে শিল্প সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসার নতুন প্রজন্মকে সৃষ্টিশীল কাজে নিয়োজিত করে। সার্বজনীন শারদোৎসব সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষকে একাত্ম করে তোলে।

শারদোৎসব আয়োজনের পাশাপাশি ক্লাব এলাকায় পারম্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, রক্তদান এবং নেশার বিরুদ্ধে জন সচেতনতা গড়ে তোলাসহ সামাজিক কাজে ক্লাবসমূহের দায়বদ্ধতা রয়েছে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে শারদ উৎসব আনন্দমুখর এবং সকলের জন্য সুখ, সমৃদ্ধি ও আনন্দের বার্তা নিয়ে আসুক।

প্রফেসর ডা: মানিক সাহা

सत्यमेव जयते

DIPAK MAJUMDER
Mayor
Agartala Municipal Corporation

MESSAGE

I am very glad to learn that MODERN CLUB is going to publish a souvenir “PRATIBIMBA" on the eve of DURGA PUJA, 2025.

A Magazine serves the organisation as its mouth piece by reporting its activities and achievements. It also publishes the contributions of its members. All these become fond memorabilia for everyone connected with the Organisation.

Besides, it also serves, very importantly, as the launching pad of the future writers and poets of repute.

I wish the magazine all success in all these activities appreciably well.

(Dipak Majumder)

সম্পা সরকার চৌধুরী
কর্পোরেটর
আগরতলা পুর নিগম
৪০ নম্বর ওয়ার্ড

শুভেচ্ছা বার্তা

ষষ্ঠী পুজোর বোধনলগ্নে আলোকজ্জ্বল সন্ধ্যায় রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাচীন ও সুনামখ্যাত ক্লাব 'মডার্ণ ক্লাব' বিগত বছরগুলির মত এবারও 'প্রতিবিম্ব' নামে পুজো স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি ভীষণ আনন্দিত। পাড়ার উৎসাহী শিশু থেকে বয়স্ক সকলের ছড়া-কবিতা-গল্প ইত্যাদি মননশীল লেখনী দ্বারা ভারতীয় সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের পরিধিকে বিস্তৃত করতে এই পুজো স্মরণিকার গুরুত্ব বরাবরই বেশ প্রশংসনীয়। আমি খুবই আশাবাদী যে 'প্রতিবিম্ব' স্মরণিকা এবারও পাঠকদের মন জয় করে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। আমি এই স্মরণিকার সাফল্য কামনা করছি এবং পাশাপাশি স্মরণিকার সম্পাদকসহ ক্লাবের কর্মকর্তা ও সদস্যদের প্রতি রইল আমার শারদীয়া শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

শুভেচ্ছান্তে—

(সম্পা সরকার চৌধুরী)

অভিজিৎ মৌলিক
চেয়ারম্যান
দক্ষিণ জোন
আগরতলা পুর নিগম

শুভেচ্ছা বার্তা

সকলের প্রতি রইলো শারদীয়ার আনন্দময় শুভেচ্ছা। 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার', দুর্গা পূজাকে ঘিরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপণা অনেকটাই বেড়েছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ শারদীয় উৎসবের আনন্দ উপভোগ করেন, ধর্ম যার উৎসব সবার পরিলক্ষিত হয়।

অশুভ শক্তিকে বধ করে বিশ্ববাসীকে অভয় আর শক্তির বার্তা দিয়ে দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা ফিরে যাবেন। প্রত্যাশা থাকবে সর্বত্র সম্প্রীতির অমিয় ধারা বহমান থাকুক।

মডার্ণ ক্লাবের সকল সদস্য-সদস্যাদের প্রতি রইল শারদীয় শুভেচ্ছা।

শুভেচ্ছান্তে—

(অভিজিৎ মৌলিক)

ক্লাব সভাপতির বার্তা

শারদোৎসবের এই পুণ্যময় মুহূর্তে আপনাদের সকলকে ক্লাব ও আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। মা দুর্গার আগমনে আমাদের জীবন আলোকিত হোক, সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বিরাজ করুক।

এই উৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা সকলে মিলে একটি সুস্থ ও সচেতন সমাজ গড়ার প্রত্যয় নিই। বিশেষ করে, আমি সকলকে নেশার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। নেশা আমাদের জীবন, পরিবার এবং সমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। নেশা একটি সামাজিক অভিশাপ। এটি শুধু ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে না, বরং সম্পর্ক, স্বপ্ন এবং ভবিষ্যৎকেও বিপন্ন করে। শারদোৎসবের এই পবিত্র মুহূর্তে আসুন, আমরা সকলে মিলে নেশার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শপথ গ্রহণ করি। আমরা অঙ্গিকার করি, নেশামুক্ত জীবন গড়ব এবং অন্যদেরও এই পথে উৎসাহিত করব।

মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের সকলকে সঠিক পথে চলার এবং নেশার অন্ধকার থেকে মুক্তি পাওয়ার শক্তি ও সাহস দিন। আসুন, একসঙ্গে একটি সুস্থ, সমৃদ্ধ ও নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তুলি।

আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আনন্দে থাকুন। শুভ শারদোৎসব।

সজল চক্রবর্তী
সভাপতি
মডার্ণ ক্লাব

ক্লাব সম্পাদকের বার্তা

শারদোৎসবে ঢাকের তালে, কাশফুলের দোলায়, আনন্দে-উল্লাসে ভরে উঠে চারিদিক। এই মিলনের উৎসব আমাদের শেখায় সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে সবাইকে একসাথে নিয়ে চলতে। সামাজিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে তুলতে। এই আবহে প্রতিবছরের মতো এবারও মডার্ণ ক্লাবের শারদ স্মরণিকা 'প্রতিবিম্ব' প্রকাশ হয়েছে। মাতৃ বন্দনার পাশাপাশি সৃজনশীল সাহিত্য আমাদের বড়ই ভালো লাগে। আশা করি সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ এ বছরের 'প্রতিবিম্ব'ও আপনাদের ভালো লাগবে।

শারদোৎসব উদ্‌যাপনের পাশাপাশি সারা বছরই মডার্ণ ক্লাব মানুষের পাশে থাকে। প্রতি বছর নেতজী জন্মজয়ন্তী ও প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিবির, রক্তদান উৎসব, বিনামূল্যে রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা, শিশু-কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসহ নানা কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে মডার্ণ ক্লাব। ক্লাবের প্রতিটি সদস্যের অক্লান্ত পরিশ্রম, আপনাদের ভালোবাসা আর সহযোগিতায় এভাবেই আমরা এগিয়ে যেতে চাই।

এবারকার আমাদের পুজোর থিম 'সিঁদুরের শক্তি'। আপনাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণেই প্রতিবছর আমাদের উৎসব পূর্ণতা পায়। এবারও দর্শনার্থীদের পদচারণায় আমাদের পুজো প্রাঙ্গণ মিলন মেলায় পরিণত হবে বলে আশা রাখি। মা দুর্গা সবার জীবনে আনুন শান্তি, আনন্দ আর সমৃদ্ধি। এই পুজো হোক হৃদয়ের মিলনমেলা, হোক ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার সেতুবন্ধন। শারদোৎসব সবার জন্য সুখ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক। শুভ শারদীয়া-

সঞ্জিত নাহা (লিটন)
সম্পাদক
মডার্ণ ক্লাব

সম্পাদকীয়—

সুন্দর, মজবুত ও সহনশীল বিশ্ব গড়ি

ধর্মের পাশাপাশি বাঙালির সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক উৎসব শারদোৎসব। প্রতিবছর শরতের নীল আকাশে পেজাতুলো মেঘ, বাতাসে দুলতে থাকা কাশফুল আমাদের মনে আনন্দের ঢেউ তোলে। ২০২৫ সালে শারদোৎসব এসেছে এক বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে।

বিশ্ব বর্তমানে এক জটিল ও বহুমুখী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে— যেখানে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ একত্রে মিলে এক অভূতপূর্ব গতিশীলতা সৃষ্টি করেছে। বিশ্বজুড়ে চলমান এই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার মধ্যে শারদোৎসব আমাদের জন্য একতা, শান্তি ও পুনর্মিলনের বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছে।

বাংলাদেশে 'গণভ্যুত্থান' এর নামে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লিগ সরকারকে উৎখাতের পর সে দেশে নৈরাজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া, জম্মু-কশ্মীরের পহেলগাঁও-এ পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গিদের হাতে ভারতের নিরীহ পর্যটকদের গণহত্যা, এর পাল্টা হিসাবে অপরেশন 'সিঁদুর'-এর মাধ্যমে পাকিস্তানকে ভারতের সমুচিত জবাব দেয়া, রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ তৃতীয় বছরে পদার্পণ করা, এই যুদ্ধকে অজুহাত বানিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারতের উপর মাত্রাতিরিক্ত শুল্ক চাপানো, মধ্যপ্রাচ্যে প্যালেস্তাইনের উপর ইজরায়েলের লাগাতার হামলায় শিশুসহ হাজার হাজার মানুষের নিহত হবার ঘটনা, সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদের পতন এবং বিদ্রোহী গোষ্ঠীর উত্থান, হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনের মাধ্যমে নেপালেও সরকারের পতন ঘটানো— এই সমস্ত ঘটনা বিশ্বের শক্তির ভারসাম্য ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে।

আবার এরই মাঝে ভারতের তথ্য-প্রযুক্তি ও মহাকাশ গবেষণায় অভূতপূর্ব উন্নতি আমরা দেখতে পেয়েছি। ভারতের বায়ু সেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন নভশ্চর শুভাংশু শুক্লা ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন ঘুরে এসেছেন। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) জানিয়েছে, মহাকাশে মানুষ পাঠাতে চলছে ভারতও। এজন্য 'গগনযান' নামে প্রকল্পে আগামী ডিসেম্বরে মহাকাশযান পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপন করবে ইসরো। এই সময়ে ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রেও উত্থান দেখা গেছে। জি ডি পি-র ভিত্তিতে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি ভারতের। এটি জাপানের মতো দেশগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জার্মানি শুধু ভারতের আগে রয়েছে। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এ আই) সবকিছুকে ছাপিয়ে যাচ্ছে।

বলা যায়, ২০২৫ সালে বিশ্ব একই সাথে চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার মুখোমুখি। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বিশ্বকে অস্থিতিশীল করলেও, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং কিছু দেশে গণতান্ত্রিক সাফল্য আশার আলো দেখাচ্ছে। এই জটিল পরিস্থিতিতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্য দরকার আরও সহযোগিতা, দূরদর্শিতা ও টেকসই উন্নয়নের প্রতি অঙ্গীকার। একটি স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আমাদের এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। একাজে শারদোৎসব আমাদের মনে শক্তি দেয়, সাহস জোগায়। আসুন, শারদোৎসবে আমরা সকলে মিলে একটি সুন্দর, মজবুত, সহনশীল ও স্থিতিশীল বিশ্ব গড়ার প্রতিজ্ঞা নিই।

আমরা সবসময়ই মনে রাখি, শারদোৎসব আজ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গণ্ডি পেরিয়ে বাঙালির জীবনের একটি সামগ্রিক উৎসবে পরিণত হয়েছে— যা শিল্প, সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ের মিলনকে আরও উজ্জীবিত করে তোলে। শারদোৎসব আমাদের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। শারদোৎসবকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে তুলতে মডার্ণ ক্লাবও সাধ্যমতো প্রচেষ্টা জারি রেখেছে। এরই অঙ্গ হিসাবে প্রতি বছরের মতো এবারও হাজির ক্লাবের স্মরণিকা 'প্রতিবিম্ব'। এবারও রাজ্য এবং বহির্রাজ্যের বিশিষ্ট লেখক, কবি, সাহিত্যিকরা 'প্রতিবিম্ব' এ কলম ধরেছেন। এই স্মরণিকা পাঠকদের ভালো লাগবে বলে আশা করি। 'প্রতিবিম্ব' প্রকাশে যাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি রইলো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। শারদোৎসবের শুভেচ্ছা নেবেন—

পার্থ সারথি দেব
সম্পাদক
'প্রতিবিম্ব'

ENVIRONMENT EDUCATION PROGRAMME
এককালীন ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জন করুন,
পূজার আনন্দে সবাই মেতে উঠুন।
শুভ
শারদীয়া
TRIPURA
tspcb
ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

যেন সোনা দিয়ে বাঁধানো পাড়। সংস্কারের পর পাখির চোখে
ক্লাব এলাকার মধ্য পুস্করিনীর মায়াবী দৃশ্য।

মধ্য পুস্করিনীর সংস্কারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য
রাখছেন এলাকার কর্পোরেটর শ্রী অভিজিৎ মৌলিক। মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী
ডা. মানিক সাহা, মেয়র দীপক মজুমদার,
ক্লাব সভাপতি শ্রী সজল চক্রবর্তীসহ অন্যান্যরা।

সংস্কারের পর ঝক্‌ঝকে মধ্য পুস্করিনী

মধ্য পুস্করিনীর সংস্কারের জন্য মেয়র দীপক মজুমদারকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে
পুষ্পস্তবক তুলে দিচ্ছেন ক্লাব সভাপতি, সম্পাদকসহ সিনিয়র সদস্যরা।

২০২৪ সালে মডার্ণ ক্লাবের হীরক জয়ন্তী বর্ষে আয়োজিত
রাজ্যব্যাপী শারদ স্মরণিকা প্রতিযোগিতায়
প্রথম স্থানাধিকারী বিলোনীয়া নলুয়ার 'সৃষ্টি' স্মরণিকাকে
পুরস্কৃত করছেন মেয়র।

২০২৪ সালে শারদোৎসবে মডার্ণ ক্লাবের মণ্ডপ ও 'প্রতিবিম্ব' স্মরণিকা
বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়।

২০২৪ সালে শারদোৎসবে আগরতলা পুর নিগমের দক্ষিণ
জোনের মধ্যে সেরা মণ্ডপের পুরস্কার পেয়েছে মডার্ণ ক্লাব।

২০২৪ সালে মডার্ণ ক্লাবের মণ্ডপ তৈরীর শিল্পীরা।

২০২৪ সালে মডার্ণ ক্লাবের মণ্ডপ উদ্বোধন করছেন মুখ্যমন্ত্রী

এবছরে (২০২৫) মডার্ণ ক্লাবের মণ্ডপের খুঁটি পূজা।

এবছরে (২০২৫) মডার্ণ ক্লাবের মণ্ডপের খুঁটি পূজায় উপস্থিত কর্পোরেটর শ্রী অভিজিৎ মৌলিক ও রাজ্যের বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক শ্রী তপন সাহার হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন ক্লাব সম্পাদক শ্রী সঞ্জিত নাহা।

(Deals with IRP, WTP, STP, ETP & Electro-Chlorinator)

An ISO 9001-2008
Dhaleswar Road No. : 15, Agartala, Tripura (W)

9774343429, 8974078022, 8837440050
adhikarygroupcompany@gmail.com
www. adhikarygroupcompany.co.in
Corporate Office : B.T. Road, Barrackpur, Kolkata 123

নদী জানে

রাতুল দেববর্মণ

নদী চঞ্চল হলে সীমানা পেরিয়ে যায়
ভেঙে ফেলে অসুগম চড়াই-উতরাই
নদী জানে গান নদী জানে দোলা
নদী একা গান গায় আপনভোলা
নদী নিয়ে গান করে সদানন্দ মাঝি
নদী নিয়ে শোলোক লেখে মাশুক নৌকাজীবী
একা জলে জেগে ওঠে পদ্মরাগমণি
দোলায় যেন একা একা পানসি ঢেউয়ের ধ্বনি
এই নগরে নাইরে বঁধু নদীর যাদু খেলা
কে দেখেছে কখন ভাসে রাঙা মেঘের ভেলা
নদী একা ভাসে গান গায় মঞ্জিমায়
মানুষ ভাবেনা এখন তার লাবণ্যকথায়

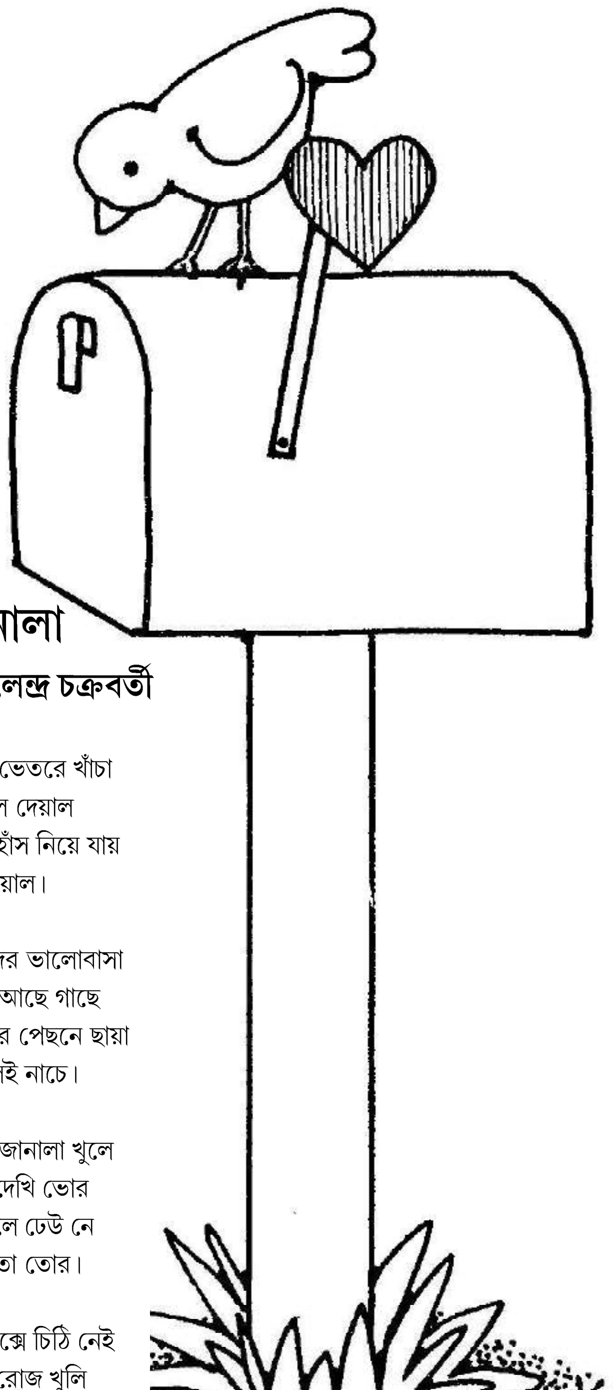

জানালা

বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী

ঘরের ভেতরে খাঁচা
দেয়ালে দেয়াল
তবুও হাঁস নিয়ে যায়
দুষ্টু শেয়াল।

পাখিদের ভালোবাসা
লেগে আছে গাছে
আলোর পেছনে ছায়া
নাচালেই নাচে।

মনের জানালা খুলে
চেয়ে দেখি ভোর
নদী বলে ঢেউ নে
স্বাধীনতা তোর।

ডাকবাক্সে চিঠি নেই
তবুও রোজ খুলি
কারণ ওখানে নাচে
দুটো বুলবুলি।

সন্ধিক্ষণ

শেখর সি. দত্ত

কর্ম পথে স্তব্ধ জীবন
কে মেরেছে, কে মরেছে
পাহাড়ি না বাঙালি
রাজনীতির ভাষা বদলায়
অবিশ্বাস পিঠ চাপরায়
এদিকে, উঠান ভরা আর্ত চিৎকার
বধুয়া ডুকরে ডুকরে কাঁদে অবেলায়।

পলাশ রাঙা অতীত
স্মৃতির মধু বাটি থেকে
চুইয়ে পড়ে
আলো আঁধার ঘরে বাইরে।
জুমের ক্ষেতে গাজন নাচ,
উজান-ভাটির সই পাতা সেই মধু ক্ষণ
কেমন বিষাদঘন প্রলম্বিত দীর্ঘশ্বাসে।

আমাদের শোক মাটি মানুষের
অশ্রু-রক্ত ধুয়ে
কলকল ঝরনা নদীতে মেশে
টুপটাপ শ্রাবণী বৃষ্টির ছন্দে,
চেতনার আন্দোলনে—

রিক্ত ক্লান্ত যৌবন বনে- বাদারে
আজ জেনেছে জীবনের মানে
রক্ত ঘামে।
খুশিতে পাক-পাখালি
হাওয়ার পিঠে চঞ্চল,
পৃথিবী সুন্দর হবে আমাদের হাসিতে।।

‘একসাথে’

সুভাশিষ কর

চলো একবার দু’জন মিলে হাঁটি,
নীরবতার সঙ্গে জমুক আলাপ;
আকাশটাও বুঝি ডাকছে দেখ কাছে,
তোমার ছায়া মিশুক আমার ছায়ায়।

পথের ধুলোয় আঁকা হোক স্মৃতি,
হাওয়ার ঝাপটায় ভিজুক আমার মন।
চোখে চোখে লিখি গোপন ভাষা,
অচেনা ছন্দে জেগে উঠুক আশা।

সূর্যাস্তের রঙে ধরা পড়ুক ভালবাসা,
চাঁদের আলোয় মিশুক দু’জনার নিঃশ্বাস।
যদি হঠাৎ ফিরিয়ে নাও মুখ,
তবুও রবে এই যাত্রাপথের সুখ।

শেষে বিদায় আসুক ধীরে,
মিষ্টি হেসে বলব মোরা ‘আসি’,
পথ দু’জনার দু’দিক যাবে চলে,
‘দুই’ হয়ে মোরা আবার হারিয়ে যাই।

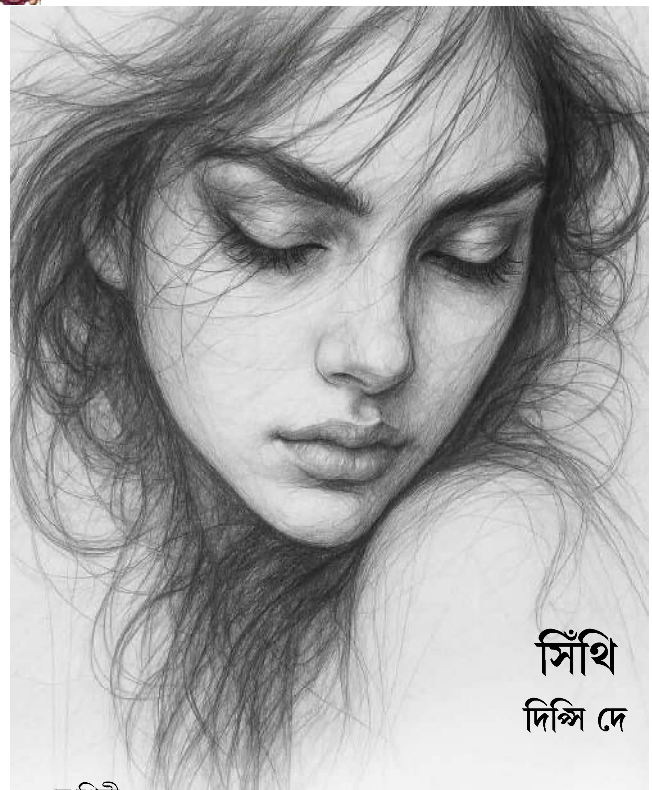

সিঁথি

দিপ্সি দে

হে শিল্পী
তোমার কাছে নতজানু হই
অথচ তোমার প্রেমিকার মুখের দিকে তাকালে
মাঝে মাঝে মনে হয় রিক্ত কথার জলে তোমাকে স্নান করাই,

ধুয়ে দিই তোমার সটান বুক জামার কলার ছিঁড়ে
নামিয়ে আনি ঘরে এরপর তোমার কাছে বলে যাই
মেঘ বৃষ্টির কথা।

তোমার প্রেমিকার ঋতুকালীন ব্যথার গল্প।

যে রাতে তোমার প্রেমিকা ছটফট করে বিছানায় তার
ঋতুকালীন যন্ত্রণা সয়ে সয়ে অথচ তুমি তখন ধারণ
করো প্রেমের কোলাজের গান,

যে অন্ধকার বৃষ্টি রাতে তোমার প্রেমিকা একা হেঁটে
যায় সেই সন্ধ্যায় তুমি মগ্ন বরষার সুরে অথচ
তোমার ঘর একা কাঁদে।

এক রাশ আলোয় হাজার মানুষের কথায় ভাসো
তোমার প্রেমিকা একা
একা ঘর
এই ভাবেই কেটে যায় বসন্ত বরষা তুমি ফিরে
ক্লান্তিময় শরীরের শেষ যাপন টুকু
ছড়িয়ে দাও প্রেমিকার সিঁথিতে।

উৎসব

গোপা চট্টোপাধ্যায়

শ্রাবণ শেষের বানভাসি জল মেখে,মাটির ওপর রঙ আঁকাটাই আলো,
দুঃখগুলোর সুখে রূপান্তর,সবার চোখে তাই তো শারদীয়।
আমার ভেতর অমোঘ যত আঁধার, তোমার ভেতর নিরন্তর যত ক্লেশ,
ওই দু'খানি চোখের আলোড়নে,যাক ভেসে যাক অপার অনিমেষ।
যে সব আকাশ শুধুই অন্ধকার, যাদের ক্ষুদ্র সামান্য সঞ্চয়,
শারদ আলোর অমল ধবল ছোঁয়ায়, যাক না মুছে সকল পরাজয়।
যে সব হিংসা চেতন অচেতনে,জমাট বাঁধে একটি বছর যাবৎ,
মৃন্ময়ী পায়ে অঞ্জলি দিই চলো,চিন্ময়ীরা থাকুক নিরাপদ।
মায়ের পুজো শুধুই পুজো নয়, নিজের ভেতর প্রাণ জাগানোর খেলা,
কুমোরটুলির অন্ধকার ওই ঘরে,জগন্মাতা ভাসান আলোর ভেলা।
ওই আলোতেই রাত খুঁজে পাক পথ, ওই আলোতেই খাক পুড়ে যাক দ্বেষ।
আমাদের থাক অলৌকিক এক শরত,উৎসবে হোক পুণ্যতোয়া দেশ।

পীযূষ রাউতের দু'টি কবিতা—

কিছুই নয়

বালেশ্বরের রেল দুর্ঘটনা
এবং আজ, এই মুহূর্ত অবধি, রোগ-শোকে
যত মৃত্যু দেখেছ কিংবা শুনেছ, তা আসলে
কিছুই নয়। কিছুই নয়।
ঠিক এক বছর পর, অপঘাত মৃত্যুর সংখ্যা
গুণে দেখার প্রত্যেকটা মানুষ,
হিমালয়সম লাশের স্তূপে একাকার হয়ে,
ভুলে যাবে কেন তারা অসময়ে চলেই গেল।
ভুলে যাবে, কেন তারা,
কী আত্মঘাতী ভুলের খেসারত
দিতে বাধ্য হলো, সময়ান্তরে আজ।

তাকে ডেকে আনা কেন

যে স্বপ্ন
একদা দিবারাত্রি, যখনতখন, এক
পাগলপারা আবেগে বিভোর করে তুলতো, সে
পশ্চিমের স্বাভাবিক ঝড়ে
উত্তরের ভয়ংকর শীতপ্রবাহে কোথায় যেন
হারিয়ে গেল।
হয়তো সমুদ্র অতলে, নয়তো দুর্গম পর্বত কন্দরে।

তাকে
এতো এতো বছর পর, যখন সে লোলচর্ম বৃদ্ধ,
যখন তার দুধে-আলতা রঙ
কালো এবং ফ্যাকাশে, বোকার মতো আজ এই
অসময়ে তাকে ডেকে আনা কেন?

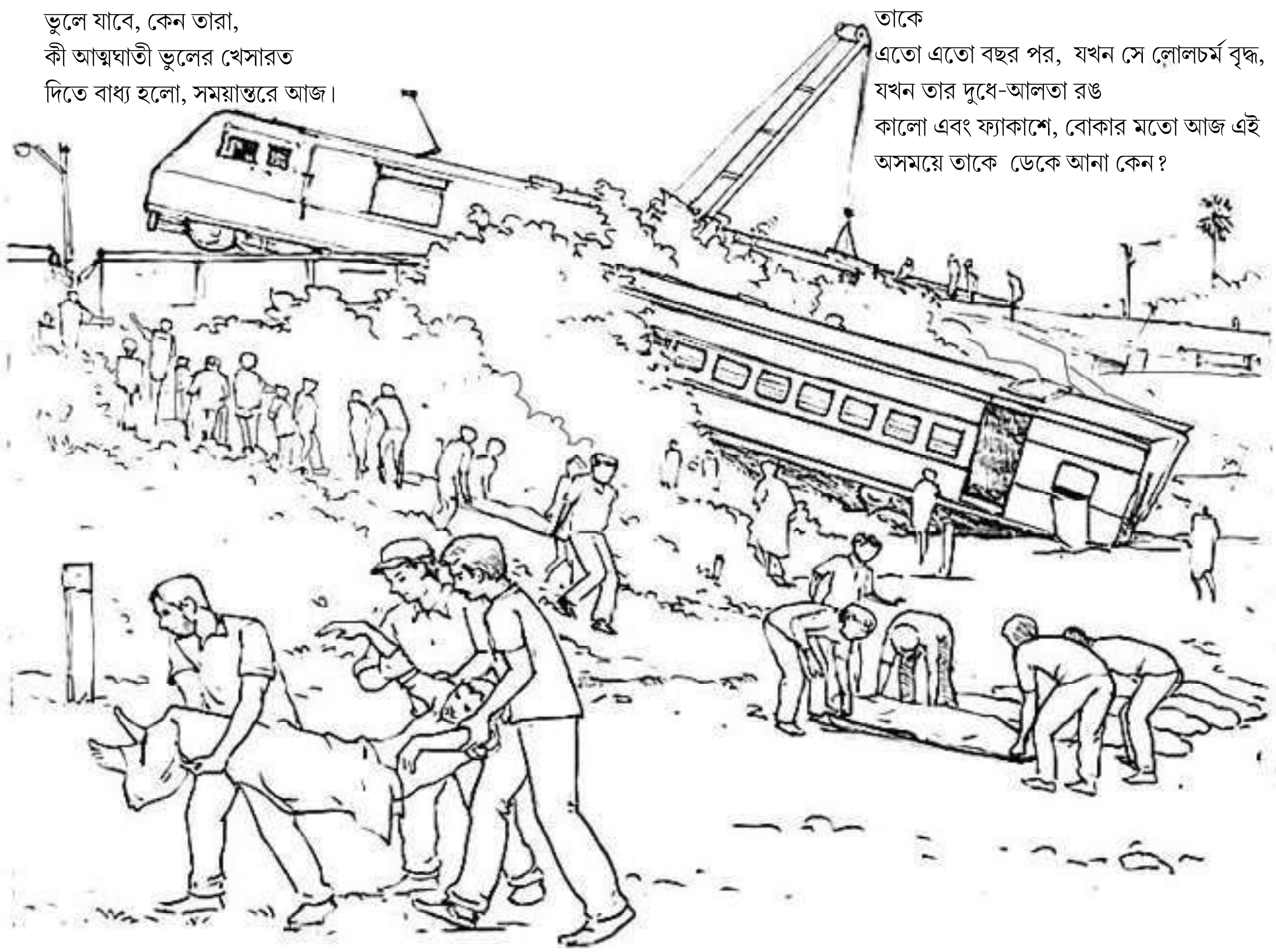

রাহ-বীর প্রকল্প (পূর্বতন গুড সামারিটান প্রকল্প)

প্রকল্পের নাম : 'রাহ-বীর' (পূর্বতন গুড সামারিটান প্রকল্প)

সময়সীমা : ৩১ মার্চ, ২০২৬

উদ্দেশ্য :

দুর্ঘটনায় আহতদের দ্রুত সাহায্যে এগিয়ে আসতে নাগরিকদের সচেতন করা ও উৎসাহ দেওয়া। সাধারণ মানুষ যাতে দুর্ঘটনায় আহতদের জীবন বাঁচাতে মানবিক দায়বদ্ধতা নিয়ে এগিয়ে আসেন।

পুরস্কার পাবার যোগ্যতা :

- দুর্ঘটনার পর আহত ব্যক্তিকে ১ ঘন্টার (গোল্ডেন আওয়ার) মধ্যে যিনি হাসপাতালে নিয়ে যাবেন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানে সহায়তা করবেন।
- 'গোল্ডেন আওয়ার' বলতে দুর্ঘটনার পর প্রথম ১ ঘন্টা সময়কে বোঝায়। এই সময়ে চিকিৎসার সুযোগ পেলে অনেক সময় মৃত্যু এড়ানো যায়।

গুরুতর দুর্ঘটনা বলতে বোঝায় :

- দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তির বড় ধরণের অপারেশন প্রয়োজন হলে
- দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তির ৩ দিনের বেশি হাসপাতালে ভর্তি থাকলে
- দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তির মাথা বা মেরুদন্ডে আঘাত পেলে
- দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসার সময়ে মৃত্যু ঘটলে

প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ঃ—

১) 'গোল্ডেন আওয়ারে' গুরুতর দুর্ঘটনাগ্রস্তদের যারা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করবেন তাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে ২৫ হাজার টাকা ও শংসাপত্র প্রদান করা হবে।

২) যদি একজন 'রাহ-বীর' একের অধিক গুরুতর দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করেন এবং হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন তবে তাকেও ২৫ হাজার টাকা ও শংসাপত্র দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে।

৩) যদি একাধিক 'রাহ-বীর' কেবলমাত্র একজন দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার মাধ্যমে তার জীবন বাঁচাতে সাহায্য করেন তবে ২৫ হাজার টাকা সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে এবং প্রত্যেককে শংসাপত্র দেওয়া হবে।

৪) যদি একাধিক 'রাহ-বীর' একের অধিক দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করেন তবে সকলকে ২৫ হাজার টাকা পুরস্কৃত করা হবে।

৫) জাতীয়স্তরে প্রতিবছর ১০ জন 'রাহ-বীর'কে ১ লক্ষ টাকা করে পুরস্কৃত করা হবে।

৬) একজন 'রাহ-বীর' বছরে ৫ বার পর্যন্ত এই পুরস্কার পেতে পারেন।

PTO

নির্বাচন প্রক্রিয়া :

- যদি কোন 'রাহ-বীর' পুলিশকে প্রথমে দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে তাহলে পুলিশ সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের কাছ থেকে সত্যতা যাচাই করে সরকারি নথিতে ঘটনার সমস্ত বিবরণ উল্লেখ করে উক্ত 'রাহ বীর'র সমন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং দুর্ঘটনার বিবরণ ও দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তির জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করেছেন সম্পর্কে সমস্ত বিবরণ দিয়ে একটি প্রাপ্তি স্বীকারপত্র Acknowledgement 'রাহ বীর'কে প্রদান করবেন। এই স্বীকৃতিপত্রের একটি কপি জেলাশাসকের নেতৃত্বে গঠিত জেলা মূল্যায়ন কমিটির কাছে পাঠানো হবে এবং তার একটি প্রতিলিপি 'রাহ-বীর'কে প্রদান করা হবে।
- যদি 'রাহ-বীর সরাসরি আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যায় তাহলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুলিশ ষ্টেশনকে এই ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করবে এবং পুলিশ উক্ত রাহ বীরের সমন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং দুর্ঘটনার বিবরণ ও দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তির জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করেছেন সম্পর্কে সমস্ত বিবরণ দিয়ে একটি প্রাপ্তি স্বীকারপত্র Acknowledgement রাহ বীরকে প্রদান করবেন।
- জেলাশাসকের নেতৃত্বে এবং জেলার পুলিশ প্রধান, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং পরিবহন আধিকারিকদের সমন্বয়ে গঠিত মূল্যায়ন কমিটিকে সংশ্লিষ্ট পুলিশ ষ্টেশন প্রাপ্তি স্বীকার পত্র সহ একটি রিপোর্ট প্রদান করবেন।
- এছাড়াও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নেতৃত্বে এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব, পুলিশ প্রধান, পরিবহন কমিশনারের সমন্বয়ে গঠিত রাজ্যস্তরীয় একটি কমিটি প্রতি চার মাস অন্তর অন্তর এই প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে।
- পুলিশ স্টেশন বা হাসপাতাল থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর জেলাস্তরের মূল্যায়ন কমিটি প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখবেন এবং প্রতিমাসে অনুমোদিত প্রস্তাবগুলি রাহ বীরদের তালিকাসহ পরিবহন কমিশনারের কাছে পাঠাবেন এবং পরিবহন কমিশনার নির্বাচিত রাহ-বীর/রাহ বীরগণকে PFMS-এর মাধ্যমে পুরস্কারের অর্থরাশি (২৫,০০০ টাকা) এবং একটি শংসাপত্র প্রদান করবে।

"আপনার একটা ফোন কল কিংবা সাহসী-
পদক্ষেপ বাঁচাতে পারে একজনের গোটা ভবিষ্যৎ।"
তাই আপনি কি রাহ-বীর হতে প্রস্তুত ?
আজই প্রতিজ্ঞা করুন - জীবন বাঁচাতে এগিয়ে আসুন।"

জনস্বার্থে পরিবহন দপ্তর থেকে প্রচারিত

ত্রিপুরা সরকার

বাংলা, বাঙ্গালি, বাংলাভাষা

মিহির দেব

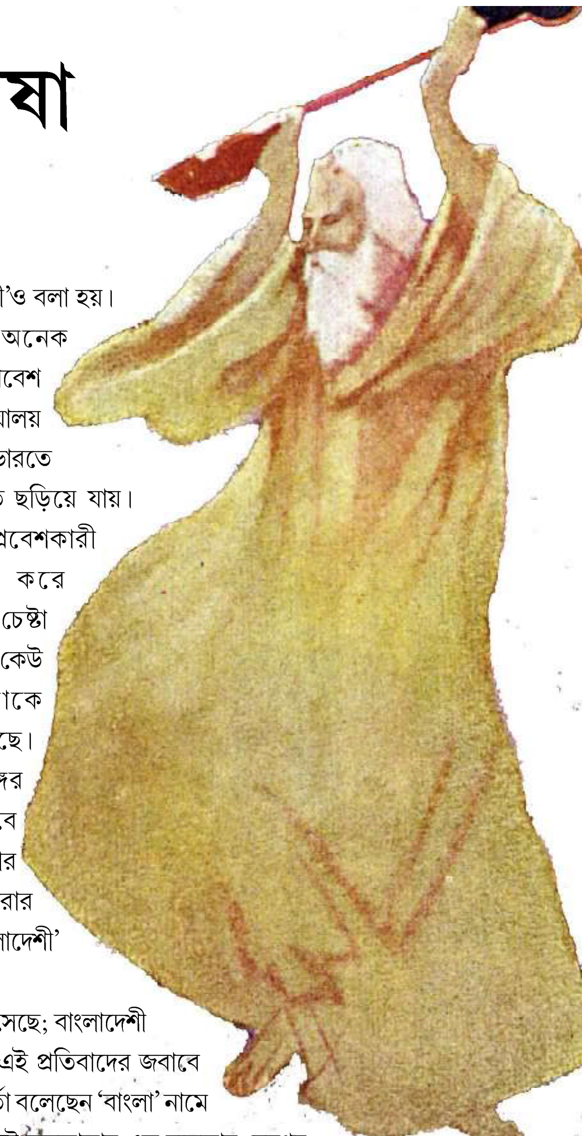

ভারত নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের মহামিলনের দেশ। ২০১১ সালের জনগণনার হিসাব অনুযায়ী ভারতবাসীদের মাতৃভাষার তালিকায় বাংলা ভাষার স্থান দ্বিতীয়। প্রায় ১০ কোটি ভারতীয়র মাতৃভাষা বাংলা। আমাদের সংবিধানের অষ্টম তফশিলেও ভারতীয় ভাষার তালিকায় বাংলার নাম আছে।

বাংলা একটি প্রাচীন ভাষা। অসমীয়া এবং ওড়িয়া ভাষার মত বাংলারও উৎস-ভাষা চর্যাপদের ভাষা। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে আসার ফলে অন্যান্য ভাষার মতই বাংলা ভাষায়ও অনেক বিদেশী শব্দ ঢুকে গেছে। সেই সঙ্গে অনাদি অতীতে বঙ্গজাতি যেসব শব্দ ব্যবহার করত আজকের বাংলা ভাষায় সেই সব শব্দও ব্যবহৃত হয়।

বাংলা ভাষা যাদের মাতৃভাষা তারা অতীত দিনে 'বঙ্গদেশ'-এর নানা অঞ্চলে বসবাস করত। ঐসব অঞ্চল তখন ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। ভিন্ন ভিন্ন রাজা ঐসব অঞ্চল শাসন করতো। এইসব অঞ্চলগুলি দখল করে ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে সাম্‌স উদ্দীন ইলিয়াসশাহ সমগ্র অঞ্চলের নাম দেন বাংলা। বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তির সম্পর্কে আসার ফলে বাংলার নাম হয়ে যায় Bengal ও পরবর্তীকালে বাংলার দুইভাগকে পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ বা East Bengal এবং West Bengal বলা হত। একই দেশের একই ভাষার কথ্য রূপে কিছু কিছু স্থানীয় রূপ থাকে। বাংলা ভাষায়ও তা আছে। কিন্তু লেখ্য ভাষায় সব অঞ্চলেই একই প্রমিত রূপ ব্যবহার করা হয়।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত ভেঙ্গে পাকিস্তান সৃষ্টি করার সময় পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান হয়ে যায়। পাকিস্তানী নেতারা চেষ্টা করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তান উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মেনে নিক। পূর্ব পাকিস্তানী বাঙ্গালিরা বাংলা ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মানতে বাধ্য করে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন 'বাংলাদেশে' পরিণত হয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষাও বাংলাভাষাই। বাংলাদেশের অধিবাসীরাও বাঙ্গালি। অনেক সময় তাদের 'বাংলাদেশী'ও বলা হয়।

আর্থ-সামাজিক কারণে অনেক বাংলাদেশী মানুষ ভারতে অনুপ্রবেশ করে। এরা ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে আসে এবং সারা ভারতে ছড়িয়ে যায়। সম্প্রতি ভারত সরকার অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশীদের খুঁজে বের করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে চেষ্টা করছে। বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ কেউ বাংলায় কথা বললেই তাকে বাংলাদেশী ভেবে আটক করছে। সমস্যা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের। তারাও নানাভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে। সম্প্রতি দিল্লীর পুলিশ কিছু লোককে আটক করার কারণ হিসাবে বলেছে তারা 'বাংলাদেশী' ভাষায় কথা বলছিল।

স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবাদ এসেছে; বাংলাদেশী ভাষা বলে কোনো ভাষা নেই। এই প্রতিবাদের জবাবে একটি রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তা বলেছেন 'বাংলা' নামে কোনো ভাষা নেই, ২২শে আগস্ট কলকাতায় এক বক্তৃতায় দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে চিহ্নিত করতে পেরে তিনি গর্বিত। এরপর স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে ঐ কর্মকর্তা তো অশিক্ষিত নন। সংবিধানের অষ্টম তফশিল তিনি জানেন না এমনটা তো হতে পারে না। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত কোন্ ভাষায় লেখা সেটা তিনি জানেন না এমনটাও হতে পারে না। তবু তিনি কেন বললেন দিল্লী পুলিশ ঠিকই বলেছে; ধৃত ব্যক্তিরা 'বাংলাদেশী' ভাষায়ই কথা বলছিলেন? তাহলে পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, আসাম এবং ত্রিপুরায় যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে তারা সবাই অনুপ্রবেশকারী? এই পরিস্থিতিতে এটা মনে করার মধ্যে ভুল নেই যে যিনি বাংলা নামে কোনো ভাষা নেই বলেন, তিনি কোনো খারাপ উদ্দেশ্যেই বলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলা ভাষার প্রচার, প্রসার এবং শিক্ষার ব্যাপারে বাঙ্গালিদের আরো বেশী সচেষ্ট হওয়া দরকার। আমরা টাকা থাকলে আমাদের সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পাঠিয়ে দিচ্ছি। অনেক বাংলা বানানে আমরা ভুল করি। এমন চলতে থাকলে বাংলা ভাষার ক্ষতি অনিবার্য।

মাটির মর্যাদা

জহর দেবনাথ

পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রাম বনলতা। চারদিকে ধানের সুবাস, পুকুরঘাটে বিকেলের আড্ডা, নদীর পাড়ে সাঁঝের আলো। সাদাসিধে জীবনের আড়ালে জমে উঠছিল জমি দখল, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর বিশ্বাসঘাতকতার গল্প।

গ্রামের প্রাণ ছিলেন সত্তোর বছরের বৃদ্ধ রঘুনাথ কাকা। তিনি বলতেন, 'ধানক্ষেত শুধু জমি নয়, এ আমাদের মায়ের কোলে জন্ম নেওয়া শ্বাস—একে হারালে বনলতা মরবে।'

কিন্তু সেই মাটির ওপরই নজর পড়ল শহরের ধনী ব্যবসায়ী হাবিবুল শেখ-এর। এলাকার দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতা গোপাল মণ্ডলকে পাশে পেয়ে সে ইটভাটা বসানোর পরিকল্পনা করে। নগদ টাকার লোভে কিছু চাষী জমি বিক্রি করলেও রঘুনাথ কাকা দৃঢ়ভাবে রুখে দাঁড়ালেন।

শহর থেকে পড়াশোনা শেষ করে ফেরা যুবক শিবনাথ, কাকার পাশে এসে দাঁড়ায় সে। অথচ ভাগ্যের পরিহাস শিবনাথের শৈশবের প্রেমিকা মাধুরী, গোপাল মণ্ডলের মেয়ে। দু'জনার সম্পর্কের মাঝখানে রাজনীতির বিষ ঢুকে পড়ল।

সুবিধা করতে না পেরে চক্রান্তকারীরা রাতের অন্ধকারে নাশকতার ছক কষে। এক রাতে পাকা ধান ক্ষেতে ধরিয়ে দেয় সর্বনাশা আগুন! কৃষকদের রক্তঘামে ফলানো সোনার ফসল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গ্রামজুড়ে কান্নার রোল, সবার চোখে মুখে ক্ষোভ আর হতাশা। সবার সন্দেহের তীর গিয়ে বিঁধল গোপালের দলের দিকে।

মাধুরীর ভাই মনোরঞ্জন গোপনে একদিন শিবনাথকে হুমকি দেয়, 'দেখ শিবু, তুই আমার বোনের বন্ধু বলে সাবধান করে দিচ্ছি, এইসব ব্যাপারে তুই মাথা গলাতে আসবি না! আর তোর কাকাকেও বলে দিবি বেশি বাড়াবাড়ি না করতে। তোরা জানিস না, ঐ হাবিবুল শেখ মানুষটা কতটা ভয়ঙ্কর! আমার কথা না শুনলে তোদের সর্বনাশ কিন্তু কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

কিন্তু শিবনাথ চুপ রইল না। সেও গ্রামের সমবয়সী যুবক বন্ধুদের নিয়ে জোট বেঁধে তৈরী। এক গভীর রাতে ওরা জানতে পারে হাবিবুলের লোকেরা ট্রাক ভর্তি করে কৃষকদের সমবায়ের বীজ চুরি করে শহরে পাচার করার পরিকল্পনা করছে। কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে নিয়ে সে ট্রাক আটকায়। অন্ধকারে শুরু হয় দুই দলের মধ্যে রক্তগরম সংঘর্ষ। শিবনাথ গুরুতর আহত হয়ে পড়ল মাটিতে।

ভোর হতে না হতেই খবর পেয়ে ছুটে আসে মাধুরী। বাবার বিরুদ্ধে গিয়ে সে শিবনাথের হাত ধরে দাঁড়ায়। ওর চোখে বিদ্রোহের আগুন দেখে সাহসী হয়ে ওঠে গ্রামের অন্যান্য কৃষক বাড়ির মহিলারাও। তাঁরাও সবাই লাঠিসোটা হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে গোপাল মণ্ডলের বাড়ি ঘেরাও করে। সারা বনলতা গর্জে ওঠে।

অবশেষে প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। খবর পেয়ে স্বয়ং মহকুমা শাসক বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে এসে হাবিবুল ও গোপালকে গ্রেপ্তার করে। বনলতার সবুজ রক্ষা পায়।

অশ্রুসজল চোখে রঘুনাথ কাকা দাঁড়িয়ে আছেন কৃষকদের পুড়ে যাওয়া ধানক্ষেতের পাশে। তার গলা ভারী, কিন্তু দৃঢ় 'আজ আমরা জিতেছি ঠিকই, কিন্তু মনে রেখো লোভীদের চোখ একবার যখন এই সবুজের উপর পড়েছে, এরা কিন্তু আবারও আসবে। আর মাটির মর্যাদা রক্ষা করতে হলে আমাদেরও কিন্তু প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্ত প্রস্তুত থাকতে হবে।'

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, গ্রামের মানুষ সবাই হাতে হাতে মশাল জ্বালিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই আগুনের আলোয় বেঁচে যাওয়া ধানক্ষেতের সোনালী ধানের শীষগুলো ঝলমল করে ওঠে! ওরা যেন বলতে চাইছে 'আমাদের রক্ষা করো, পুড়ে ছাই হয়ে যেতে দিওনা।'

আকাশে কালো মেঘ জমে উঠছে, দূরে নদীর গর্জন শোনা যাচ্ছে। মশালের আলোয় কৃষক, নারী, শিশু সবাই একসাথে শপথ নিচ্ছে 'আমাদের মাটিই আমাদের প্রাণলোভীদের হাতে তা কোনভাবেই নয়।'

কিন্তু অন্ধকার আকাশের ওপারে কোথাও যেন হাবিবুল আর গোপালের মতো অশুভ চোখ এখনো জেগে আছে। বনলতার সংগ্রাম এখানেই শেষ হয়নি, কেবল শুরু হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ কিতাবে নয়, সবার হৃদয়ে ও কর্মে থাকুক

—সঞ্জীব দে

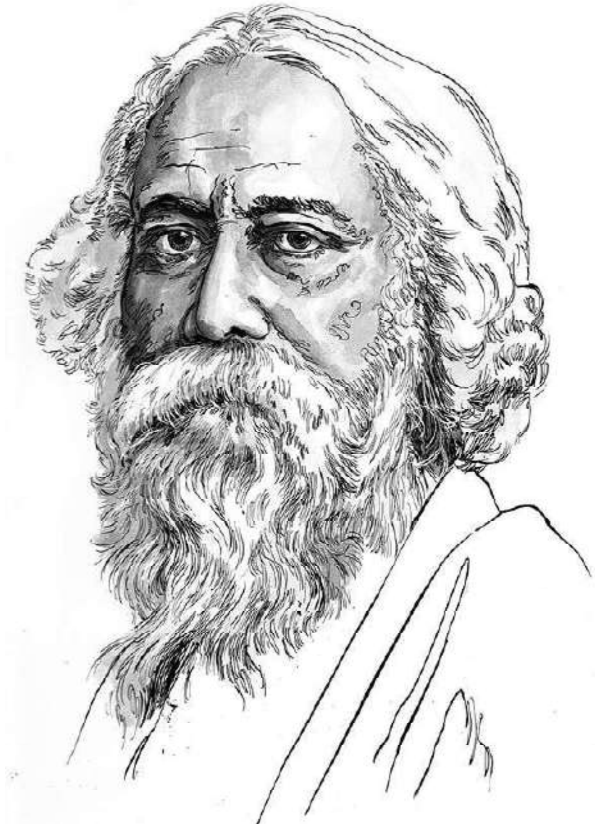

'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ ওরে অবুজ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।'
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে আমরা ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাবো সমাজের উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে দু'টি অনুভব কাজ করছে। এক ধরনের শুভ অনুভব রয়েছে, যা সমাজকে উন্নতির সোপান বেয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আবার আর এক ধরনের তীব্র অশুভ অনুভব রয়েছে, যা সমাজকে পেছনের অন্ধকারের দিকে গতিমুখ ফেরানোর চেষ্টা করছে। যদিও অশুভ অনুভবগুলি ধ্বংসের মুখে একদিন নিদারুণভাবে নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু শুভ অনুভবগুলি শেষ পর্যন্ত চিরন্তন সবুজতা লাভ করে অমরত্বের অধিকারী হয় সৃষ্টির পথ ধরে। দেশের সেরা সম্পদ হচ্ছে যুব শক্তি। এই শক্তি যদি বিপথগামী হয়, তা হলে দেশ ও দশের বিপদ। যুব শক্তিই পারে 'দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' অতিক্রম করে সমস্ত অসাধ্যকে সাধন করতে। তাই যে বা যাঁরা দেশের কাণ্ডারী, তাদের উচিত যুব শক্তিকে ন্যায়ের পথে পরিচালনা করা। যুব সমাজই পারে উন্নত শিরে সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে বিজয় মাল্য পরতে। চির যুবক ভাবনার সাগর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই শুভ অনুভবের মাঝে উজ্জ্বল ভাস্বর। তাই তো গুরুদেব বলেছেন মানুষের বিপদে উঠে দাঁড়ানোর শক্তি সঞ্চয় করতে। মাথা- হাত-হৃদয়ের মিশ্রিত আর্তিতে নৈতিকতাকে রুচিতে পরিণত করে, আত্মস্থ সম্যক জ্ঞানের আলোকে নিজেকে পূর্ণতার দিকে চালিত করার শক্তি যেন না কমে। একদিন আলদা আলাদা স্বতন্ত্র মানবিক সত্তা এক হয়ে মানবিক সমাজ গঠন হবে। সেই মানবিক সমাজ থেকে ধীরে ধীরে সমন্বয়ের সূত্রে বিশ্বমানবতা বোধ উৎসারিত হবে।

সংগীত, শিল্প, কবিতা নৃত্য এরা মিলে আনে আত্মার পূর্ণ সৌকর্য। কবিগুরুর এই সবগুলি গুণই বিদ্যমান ছিল। তাই তিনি যুবক-যুবতীসহ সবাইকে মনের সংকীর্ণতা বর্জন করে আত্মার পরিপূর্ণ সৌকর্যের দ্বারা মানুষের কল্যাণে আঠারোর উত্তাপকে বিপদ মুক্ত করে দেশ সেবায় নিজেকে প্রস্তুত করে তোলার আহ্বান করেন। কবিগুরু শুধু যুবকদের বলেননি, তিনি তাঁর সাহিত্য মঞ্চে দুনিয়ার সূক্ষাতি-সূক্ষ এমন কিছু তাঁর দৃষ্টির অগোচরে ছিলনা যা উপস্থাপন করেননি। তাঁর সাহিত্য বীণার মধুর সুরে বিশ্ব হৃদয় মোহিত ও প্লাবিত। তাঁর সঞ্চয়িতাকে আমি মনে করি প্রত্যেক মানুষের জীবনের একটি মনস্তাত্ত্বিক ঔষধ। ভাবনা প্রকাশের যতগুলি মাধ্যম রয়েছে গুরুদেবের এমন কোন মাধ্যম নেই যার মধ্যে তাঁর পদচারণা নেই। অংকন, সংগীত,

নৃত্য, বিজ্ঞান, ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুত ব্যোম, ব্রহ্ম, মঙ্গলসহ সব ক্ষেত্রে ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের ১২ বছর অংকন শিল্পে ব্যস্ত ছিলেন। ৪০০ ছবি নিয়ে ইংল্যান্ড আর্ট প্রদর্শনীতে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। প্রায় ২০০০ ছবি এঁকেছেন তিনি। তেমনি আবার প্রায় ২০০০ সঙ্গীতও রচনা করেন। সংগীতে কবি একাই অর্ধেক আকাশ দখল করে আছেন। কবিগুরু সংগীত যেমন রচনা করেছেন, তেমনি সুর, তালও সৃষ্টি করেছেন সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গীতে। যেমন, 'নিবিড় ঘন আধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা.......'রবীন্দ্র সৃষ্টতাল -- নবতাল গুমাত্রা-৯ বিভাগ-৪. ছন্দ--৩/২/২/২

ঠেকা

৩ ২ ২ ২

ধা দেন তা / তিট কতা /গদি গনে /ধাগে তেটে / ধা

আবার ৫/৪ ছন্দে গান রচনা করেছেন -'ব্যাকুল বকুলের ফুলে ভ্রমর মরে পথ ভুলে.......'

ঠেকা

৫ ৪

ধা ধি না ধি না / ধা ধি ধি নানা /

অন্যদিকে তিনি ষষ্ঠী, একটানা ছন্দ, রূপক, রূপকড়া, ঝম্পক, অর্ধঝাঁপসহ চতুর্মাত্রিক তালেও গান রচনা করেছেন— সবারে করি আহ্বান..... গানটিকে তিনি চতুর্মাত্রিক তালে বেঁধেছেন। তিনি তবলায় ঠেকা দিয়েছেন— ধা ধিন /নানা কতা/ধা।

এই ভাবে কবিগুরু নিজেকে প্রকাশ করতে করতে সাহিত্য সমুদ্রে নিজেই আরেক সমুদ্র হয়ে বসে আছেন উজ্জ্বল আসনে। এক সময় তিনি স্বরচিত গান ধরলেন নিজের সৃষ্টি ষষ্ঠী তালের উপর— 'হৃদয় আমার প্রকাশ হলো অনন্ত আকাশে ---'

সত্যিই তো তাঁর বিশাল সাহিত্যের ভান্ডার এই এক বিস্ময়। আবার তিনি কখনো বলে উঠেন মুক্ত হৃদয়ে—

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন, ধরো হাত সবাকার।

এইভাবে তিনি সবাইকে এক হয়ে যাওয়ার আহ্বান করেন। বিচ্ছিন্নতা থেকে তিনি বার বার বিশ্বমানবতার কথা উচ্চারণ করেন।

আবার কখনো কবিকে বলতে শোনা যায় ধর্মের বিকৃতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে। এক চিঠিতে তিনি লেখেন 'শস্তায় পাপমোচন ও পুণ্যফল পাবার হাজার হাজার কৃত্রিম উপায় যে দেশের পঞ্জিকায় ও ভাটপাড়ার বিধানে অজস্র মেলে সে দেশের বীর্য, সাধ্য, সত্য সাধ্য, ত্যাগ সাধ্য, বুদ্ধি সাধ্য, ধর্ম সাধনা বিকৃত না হয়ে থাকতেই পারে না।'

রবীন্দ্রনাথের মননে নৈতিকতা ও উন্নত রুচিবোধ মিলে মিশে একাকার। যার কারণে নৈতিকতা তাঁর রুচিতে পরিণত হয়ে গেছে। তিনি রাষ্ট্র যন্ত্রের খারাপ দিক নিয়ে যেমন ধিক্কার জানিয়েছেন আবার সব সময় সমাজের পক্ষেও কথা বলেছেন। তিনি সব সময় বৃহত্তর সমাজের পক্ষেই ছিলেন। তিনি শুধু বন্ধ ঘরে বসে সৃজন উৎসবে মেতে থাকেননি, তিনি মানুষের বিপদে রাস্তায় নেমেছেন, সাধারণ মানুষের পাশে ছুটে গেছেন। তিনি বার বার ধনবৈষম্য দূর করার কথা বলেছেন। সমাজের বিচ্ছিন্নতার দৌরাত্ম্যে তিনি উদ্বিগ্ন থাকতেন, রক্তকরবী তার প্রমাণ। তিনি মনে করেন পুঁজিবাদ ধনবৈষম্যকে পুষ্ট করেছে। পল্লীসমাজে তিনি বলেন— 'আমরা এক দেশে আছি অথচ আমাদের এক দেশ নয়।' ধনী ও গরীব দু'টো দেশে আমরা বিভক্ত। স্বদেশী সমাজে তিনি বলেন— 'রাশিকৃত বিচ্ছিন্নতা স্তূপাকার করিতে থাকিলেই তারা এক হয় না।' আরেকটি জায়গায় তিনি বলেন— 'বিচ্ছিন্নতা যেখানে প্রবল, সেখানে বিপ্লব না এলে তার সমন্বয় হয়না, কি সমাজতন্ত্রে, কি ধনতন্ত্রে, কি রাষ্ট্রতন্ত্রে।' তাই তিনি ধনবৈষম্য দূর করা অনিবার্য বলে মনে করেছিলেন। ধনী-গরীব এই দুই সত্যকে মেনে তিনি মাঝামাঝি একটা সমাধান সূত্র বের করার কথা বলেছিলেন। এই সমাধান এখনও পাওয়া যায়নি! বরং ধনবৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতা বহু বহুগুণ বেড়ে চলেছে। যা পৃথিবীকে আরও অস্থিরতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাই তিনি বলেন— 'সমাজের দুর্বলতাগুলোকে ভেতর থেকে সংশোধন করতে হবে সামাজিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে নয়।' তিনি নিজেও চেষ্টা করেছেন ব্যক্তিগতভাবে। তাঁর উদ্যোগে ও আর্থিক সহায়তায় কৃষি ব্যাংক, সমবায়, বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়ের মতো সুন্দর পরিকল্পনাগুলো কার্যকর করেছেন। সমাজ পরিচালনার জন্য তিনি আদর্শ নেতৃত্ব গড়ে তোলার কথা বলেন। কারণ একজন আদর্শ নেতৃত্বই পারে আদর্শ সমাজ গঠন করতে।

প্রয়োজনে তিনি কলম ছেড়ে বঙ্গভঙ্গের সময় সবাইকে একসূতায় বাঁধার অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন। তাতে যখন উগ্রজাতীয়তাবাদী ভাবনা প্রকট হয়েছে তিনি একসময় নিজেকে সরিয়েও এনেছেন। উগ্রজাতীয়তাবাদকে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে এক সাথে থাকার পক্ষে। তাই তিনি বলতে পারেন আমি তোমাদেরই লোক। আবার দেখা গেছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে। পৃথিবীর সমস্ত রকম অন্যায়, অত্যাচার,জাতিভেদ, বর্ণ বৈষম্য, শোষণ, কুসংস্কার ইত্যাদি যেখানে তিনি দেখেছেন সেখানে তিনিই ছিলেন প্রথম প্রতিবাদ। ভারতে বাঙালিরা যতই প্রান্তে থাকুক, এক শ্রেণির নাম দেওয়া বহির্বঙ্গেই থাকুক, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সবসময় সবক্ষেত্রে কেন্দ্রেই ছিলন। পৃথিবীতে বৈষম্য শোষণ বঞ্চনা যতদিন থাকবে, রবীন্দ্রনাথ ততদিন বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্রে থাকবেন এবং চির প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবেন। শারীরিক ও মানসিক নিরসল কর্ম চঞ্চলতা তিনি কখনও ত্যাগ করেননি। তাইতো নাটকে, চিত্রকলায়, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, কবিতায়, লোকসাহিত্যে, পরিবেশ সুরক্ষায়, বর্ষা মঙ্গলে, মহামারী, বিপর্যয়ে, বাদে-প্রতিবাদে সর্বত্রই তাঁর উপস্থিতি উজ্জ্বল। তাই হয়তো তাঁর ভাবনার বৈচিত্র্যকে ধারণ করা একজীবনে অসম্ভব। কোথায় গ্রহণ করতে হবে, কোথায় বর্জন করতে হবে, সব তার সুন্দর নৈতিক রুচির পরিচয়। তাইতো জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে বৃটিশদের দেওয়া নাইট উপাধি ত্যাগ করতে পারেন। ঠিক সেইরকম বর্তমানে ঘটে যাওয়া পহেলগাঁও হামলার প্রতিবাদে কতজন কবি প্রতিবাদ করে নৈতিক রুচির পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশ্ন চিহ্নের মুখে। এখানেই একজন কবির দৃঢ়তার প্রশ্ন! তিনি মনে

প্রাণে এমন এক দেশের স্বপ্ন দেখতেন যে দেশে মানুষ হবেন মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন, যারা সত্যের গভীর হতে এক একটা শব্দ উচ্চারণ করবেন। যেখানে জ্ঞান হবে মুক্ত। সেই কবির দেশে সংকীর্ণতার কোন স্থান থাকবে না। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক পর্যায়ে সুখে দুঃখে আনন্দে রবীন্দ্রনাথ এক দুর্দান্ত টনিকের মতো কাজ করে। বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহস যুগিয়ে যেমন বলতে পারেন 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এই নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে যেন নাহি করি ভয়।' আবার দেশপ্রেমে যুবকদের এগিয়ে যেতে অভয় দিতে বলতে পারেন— 'মোরা ভয় করবোনা ভয় করবোনা, দু'বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরবো না।' —জীবনের ক্ষেত্রেও নির্ভয়ে শক্তি জোগানোর এ যেন এক ঘুরে দাঁড়ানোর অভয় মন্ত্র।

ভারতবর্ষ হলো সহিষ্ণুতার দেশ, মহামিলনের পুণ্যভূমি। মহামিলনের দেশে হিংসা, জাতপাতের ঘৃণ্য বাতাবরণ ও বিভেদের প্রাচীর একদম বেমানান। সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে বৈদিক মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে বিশ্বমানবতাবাদের মিলন ক্ষেত্র। কিন্তু একসময় জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা বিষবাষ্পে এদেশ আচ্ছন্ন ছিল এবং এখনও আছে। জীবন তখন যেমন এইসব সংকীর্ণ অমানবিক ভাবনায় কলুষিত ছিল, এখনও আছে। সেই কালিমালিপ্ত সংকীর্ণ ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে ভারতবাসীরা মহামিলনের মন্ত্রে ঐক্যবদ্ধ হোক, কবি রবীন্দ্রনাথের এটাই মনের গভীর থেকে কামনা ছিল জীবন দেবতার কাছে। তাই কবি আর্য, অনার্য, হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, ব্রাহ্মণ পরিচয় হাত মিলিয়ে মানবতার পূর্ণতীর্থক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। কবি স্বপ্ন দেখেছেন একান্ত চেষ্টায় সকলের স্পর্শে পবিত্র হয়ে উঠেছে এই তীর্থ নীড় ভারতবর্ষ। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মৈত্রীর মিলনে হয়ে উঠবে এক নতুন ভারতবর্ষ। ভারততীর্থ কবিতায় কবি এই কথাগুলোরই ছন্দিত ভাব প্রকাশ করেছেন। এটাই ছিল তার ভেতরের গভীর আর্তি।

রবীন্দ্রনাথ তাই চির প্রাসঙ্গিক। বর্তমান ভারতে যেভাবে বহুত্ববাদের মাঝেও সহিষ্ণু ভারতের ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করার যে সাম্প্রদায়িক প্রয়াস চলছে, এর বিরুদ্ধে সমস্বরে প্রতিবাদ ধ্বনিত করতে হলে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। এমন এক পরিস্থিতিতে আমাদের ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য রবীন্দ্রনাথকে আরো বেশি করে জানা আমাদের প্রয়োজন। সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে চলুন আমরা মানুষের জাত হিসাবে সমস্ত শুভ অনুভবগুলি হাতে হাত হৃদয়ে হৃদয় মিলিয়ে শপথ করি যে আমরা আমাদের দেশের প্রাচীন মিলন ক্ষেত্রের ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে সমস্ত রকম বাধা বিঘ্নকে পেছনে ফেলে সমস্বরে সমস্ত রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শামিল হবো। রবীন্দ্রনাথ কিতাবে নয়, সবার হৃদয়ে ও কর্মে থাকুক। তাঁর বৈচিত্র্যময় ভাবনায় সবার মনন জেগে উঠুক।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি

হ্যালো বেবী

নির্মল অধিকারী

এই তো কয়েক মাস আগে, মিলন চক্রের ঘটনাটা না বললেই নয়। একটা ছোট্ট বাজার আছে। তবে বাজারে ব্যবসায়ীরা বসতে বসতে রাস্তা পর্যন্ত এসে গেছেন। নিয়ম না মানাটা আমাদের চিরকালের অভ্যেস। অসিত ইতস্তত এদিক-সেদিক ঘুরছিল। হঠাৎ দেখা পায় রুমা, তার বর ও তাদের ছোট্ট কন্যার। কথা বলতে বলতে জানা গেল, পুনের বাঙালিবহুল কোড়িপট অঞ্চলটায় দুর্গা পূজার এ সময়টায় দশ দিনের স্কুল বন্ধ চলে। তাই রুমারা আগরতলায় বাপের বাড়িতে ঘুরে যাওয়ার জন্য এসেছে। কথায় কথায় আরো জানা গেল, রুমার বরের বাড়ি ছিল সোনামুড়ায়। রাজ্যের ছেলে। এখন আর ওখানে কেউ থাকেন না। অসিত সম্পর্কে রুমার কাকু হন। পাড়াতো কাকু। তাদেরকে দেখে অসিতের খুব ভাল লাগল। আবহাওয়াটাই এখন ভাল লাগার। শরতের আগমন, থোকা -থোকা মেঘ, আর মা আসছেন। তাই আনন্দ! অসিত রুমার মেয়ের সম্পর্কে দাদু। অসিত দোকান থেকে একটা ক্যাডবেরি চকোলেট কিনে, রুমার মেয়েকে দিয়ে বলল,'দাদুভাই, তোমার নাম কি?'

মেয়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, দাদুকে চুল পাকা দেখতে অভ্যস্ত, বয়স্ক হওয়ার কথা! তার মার থেকে তিন-চার বছরের বড় হবে, বাবার থেকে অন্তত বারো-তেরো বছরের ছোট, ঐ ভদ্রলোক কিনা তাকে দাদুভাই ডাকছেন। দাদুভাইয়ের দিকে চেয়ে রুমার মেয়ে উত্তর করল,'আমার নাম সোমা।'

'বাহ্ কি মিষ্টি নাম!' অসিত প্রতিক্রিয়া জানাল।

রুমারা বাজারে ঢুকে বাজার করছে, আর টুকটাক কথা চলছে। ঝিঙে দেখে খুব ভাল লাগল। দাম জিজ্ঞেস করে রুমা বলল, 'বেবী, দুই কেজি নিয়ে নেব।'

অসিত ভাবল, রুমা তার মেয়েকে কথাটা বলেছে। খটকা লাগলো তখন, যখন উত্তর দিচ্ছে বুড়ো বুড়ো ভাব ধরা তার বর। আরো এক দুইবার রুমা 'বেবী','বেবী' বলে ডাক দিল। একজন দোকানদার থেকেই অল্প বাজার করে অসিতকে বিদায় জানিয়ে রুমারা বাজার ছেড়ে ঘরের দিকে হাঁটতে থাকে।

দোকানদার সবজি ব্যবসায়ীও সকল কথার মাঝে মাঝে একটু অবাক হয়ে 'বেবী' ডাকটা শুনছিল। অসিত তাদেরকে এগিয়ে দিয়ে, সবজি ব্যবসায়ী দাদার কাছে আবার ফিরে আসে। ইতিমধ্যে বাজার কমিটির সেক্রেটারি কোন একটা কাজে এই দোকানটায় আসে। ভারী রসিক লোক। অসিত ও ব্যবসায়ী দাদার নিজেদের মধ্যে কথাটা আলোচনা হচ্ছিল। সেক্রেটারি দাদাও কথাটা শুনে হাসতে থাকেন। তাদের একটা ধারণা, নিজের মেয়েকেই 'বেবী' বলে রুমা ডাকছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল, উত্তর যে দিচ্ছে তার বর! হঠাৎ সেক্রেটারি দাদার মাথায় কিছু একটা খেলে গেছে। তিনি বললেন,'কাম সারছে! তোমরা ইডা জান না। নিজের থেকে দুই-তিন বছরের বড় লোককে বড় বড় শহরের মেয়েরা কাকু বলে ডাকে। অথচ দশ-পনেরো বছরের বড় স্বামীকে 'বেবী' ডাকতে ওস্তাদ। এখন এমনটাই চলছে।'

হাসিমুখে ব্যাপারটা সমাধান হলেও অসিতের মনে আজও ওই ডাকটা প্রশ্ন হয়েই রইল। ফেসবুকের মত কমেন্টে উত্তর দেওয়ার সুযোগ থাকলে অবশ্যই অসিত এইরকম লিখত,'উত্তরটা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন।'

অসিত এই গল্পটা অনেক বুদ্ধিমান লোককে বলেছে। প্রশ্নের উত্তরের জন্য কাউকে গল্প বললে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একটাই উত্তর আসে,'কাম সারছে!'

ভবিষ্যতে রুমার বরকে দেখলেই বলতে হবে,'হায় বেবী, হ্যালো বেবী!'

জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা বড্ড আনন্দ দেয়। এটাও এর মধ্যেই অন্তর্গত।

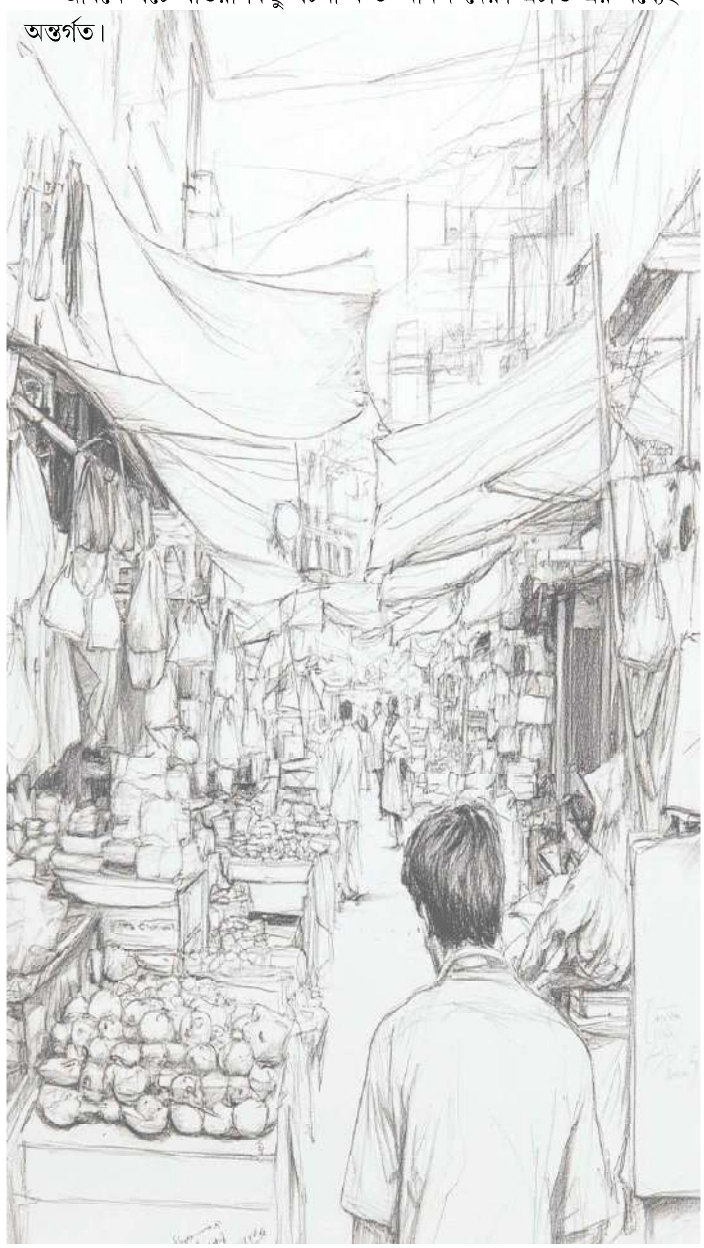

রাজ্যের সকল ভোক্তাদের প্রতি
ত্রিপুরা সরকারের আবেদন

- যেকোন কেনাকাটায় রসিদ নিন। রসিদে দ্রব্যের নাম / পরিষেবার বিবরণ ও তারিখ থাকা দরকার। গ্যারান্টি / ওয়ারান্টি থাকলে সেটাও বুঝে নিন।
- রেশন সামগ্রী নেওয়ার সময় e-POS মেশিন মুদ্রিত রসিদ চেয়ে নিন এবং রসিদে উল্লেখিত দ্রব্যাদি আপনি পেয়েছেন কিনা তা যাচাই করে নিন।
- ভূয়া এবং প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পা দেবেন না।
- মেয়াদকাল উত্তীর্ণ কোন জিনিস কিনবেন না।
- অপরিচিত কোন ব্যক্তির কাছ থেকে আপনার টেলিফোনে আসা অর্থপ্রাপ্তি সংক্রান্ত কোনো বার্তা বা লোভনীয় প্রস্তাবে সাড়া দেবেন না।
- আপনার এ.টি.এম কার্ডের নম্বর, মেয়াদের তারিখ ও সি.ভি.ভি নম্বর কাউকে জানাবেন না।
- ক্রেতা হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে মনে করলে উপযুক্ত ভোক্তা কমিশনে বা ন্যাশনাল কনজিউমার হেল্প লাইনে অভিযোগ দায়ের করে প্রতিকার আদায় করে নিন। ভোক্তা কমিশনে আপনি অনলাইনেও অভিযোগ জানাতে পারেন।

ন্যাশনাল কনজিউমার হেল্প লাইন
১৯১৫

ই-ফাইলিং পোর্টাল
www.edaakhil.nic.in

রাজ্য কনজিউমার হেল্প লাইন
১৮০০-৩৪৫-২৬৬৫

জাগো গ্রাহক জাগো

সচেতন হউন ঃ সুরক্ষিত থাকুন

ত্রিপুরা সরকারের খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের পক্ষ থেকে জনস্বার্থে প্রচারিত

আট দেশের পথে-প্রান্তরে

নিশীথ সূর্যের দেশে একদিন! ছবি : ডা. স্বপন চৌধুরী
নরওয়ের ট্রমসোতে তোলা ছবিটি দেখে কি বিশ্বাস করা যাচ্ছে, ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী তখন মধ্যরাত?

ইউরোপ ভ্রমণ

জবা চৌধুরী ❑ আটলান্টা

বছর কয়েক আগে অবদি জামা-কাপড়, সাজগোজ আর হাল ফ্যাশন— আমার মাথায় যখন-তখন কাবাডি খেলে বেড়াতো। তারপর কি হলো জানি না। বয়সের পেরোনো নানা ধাপের শেষে ধীরে ধীরে রুচিবোধ ভিন্নমুখী হতে শুরু করলো। অজানা দেশ, সেখানকার অচেনা লোকজন, সংস্কৃতি আর আফ্রিকার বন্যপ্রাণীদেরকে দেখা— এসব দিকেই মন ঝুঁকতে লাগলো বেশি করে। এই সেদিনও এক কাপ ধোঁয়া ওঠা কফি খেতে খেতে অনেক ভাবলাম। শেষ পর্যন্ত একটা জায়গায় এসেই বারবার সব চিন্তাকে থেমে যেতেও দেখলাম। বুঝলাম, পরিবর্তনটার শুরু কখন থেকে। সে আর কিছু নয়— কোভিডের দুরাচার। সেই ভয়ংকর সময়ে অনেক প্রিয় পরিজনের অসময়ে বিদায় অনেকেরই মতো আমাকেও পাল্টে দিয়েছে অনেকটা— সেটা আমি খুব বুঝতে পারি। জীবন অজানা, অপ্রত্যাশিত জেনেও সেই ভাবনা আমার দৃষ্টিকে, মনের ইচ্ছেকে, সামনে পড়ে থাকা অজানা ক'দিনেও তাই পূর্ণ করতে আজকাল মন চায়।

ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে গেলে, বিশেষ করে স্কুলের পাট শেষ হয়ে গেলে 'গরমের ছুটি'র এক্সাইটমেন্ট অনেকটা কমে যায়— আমার অনেক বন্ধুরাই এমনটা বলেন। কিন্তু আমার মতামত ভিন্ন। আমার কিন্তু মনে হয় ছেলে-মেয়ে বড় হবার পর থেকে গরমের ছুটি এখন বরং 'টেনশন ফ্রি' হয়ে উপভোগ করতে পারি আমি আর আমার হাজব্যান্ড স্বপন।

এ বছরের গরমের ঋতু আসার তখনও অনেকটা বাকি। ইতিমধ্যেই আমাদের বাড়িতে গরমের ছুটির নানা পরিকল্পনা শুরু হয়ে গেছে। ঠিক হলো আমরা নরওয়ে বেড়াতে যাবো। আমার কাছে অলরেডি প্ল্যানটা সুপার-ডুপার ! প্রকৃতির আরেকটি বিস্ময় রূপ দেখা হবে। ছুঁয়ে দেখবো অনেক আকাঙ্ক্ষার নিশীথ সূর্যের দেশকে।

সেদিন দুপুরে তখন 'সুইট চিকেন' বানানোর রেসিপি ঘাঁটছিলাম ইউটিউবে। এমন সময় এক ভাগ্নের ফোন এলো। কথায় কথায় জানালাম আমাদের নরওয়ে বেড়াতে যাবার প্ল্যানের কথা। সে আমার কথা শেষ হতেই বলে উঠলো— 'ওমা! শুধু একটা দেশ দেখেই চলে আসবে?'

আমি আর কিছু বললাম না। সেই দুঃখের কথাটি লম্বা মুখ করে স্বপনকে জানালাম। সে হাসলো। তখনও আমি জানতাম না আমাদের বেড়ানোর দীর্ঘ প্ল্যানের কথা। সেটা স্বপন সারপ্রাইজ দেবার কথা ভেবে আগে আমাকে বলেনি। জিজ্ঞেস করলো, 'কয়টা দেশ দেখতে চাও, বলো?' কী ভেবে বলেছিলাম মনে নেই। একটু থেমে বললাম, 'আটটা।' আসলে ওই চত্বরের যতগুলো দেশের নাম মনে পড়েছিল— সবগুলো দেখার ইচ্ছেটাই জানিয়ে দিলাম।

আর, সেই ইচ্ছেকে সামনে রেখেই একদিন আটলান্টা থেকে শুরু হলো আমাদের ইউরোপের স্বপ্নভ্রমণ ! এবার মেয়ে ছুটি পেলো না কাজ থেকে। তাই স্বপন, আমি আর আমাদের ছেলে তুতাই বেরোলাম ইউরোপ ভ্রমণে।

ইচ্ছে রইলো আমার এই লেখায় সদ্য বেরিয়ে

আসা সবগুলো দেশের কথা তুলে ধরার।

ফিয়র্ডের স্বপ্নরাজ্য নরওয়ে

আটলান্টা থেকে দীর্ঘ আকাশপথ শেষে যখন নরওয়ের মাটি ছুঁলাম, মনে হলো পৃথিবীর সবচেয়ে শান্তির জায়গায় এসে পড়েছি। প্রথম আমরা প্লেনে আসি ওসলো শহরে। সেখানে একদিন থেকে বিশেষ দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখে নিলাম। ওদের প্রাসাদ, ইউনিভার্সিটি, অপেরা হাউস, পার্লামেন্ট ইত্যাদি বিশেষ জায়গাগুলো আমরা ঘুরে বেড়ালাম। এসব শেষ হতেই ডিনারের চিন্তা মাথায় এলো। একটা কথা না বললেই নয়। আমরা যে দেশেই বেড়াতে যাই না কেন— রাতের খাবারের ইচ্ছে আমার বরকে দেশি রেস্টুরেন্টের কথা ভাবায়। এবারও এর ব্যতিক্রম হলো না। আমাদের ইচ্ছের কথা জেনে ড্রাইভার আমাদেরকে ঠিক পৌঁছে দিলো এক দেশি রেস্টুরেন্টে। নাম— জয়পুর ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট। এক জনবিরল দেশে ভারতীয় মশলার স্বাদ অবশ্যই একটা খুশি এনে দিলো।

পরদিন ভোরে ট্রমসো যাবার ফ্লাইট। হোটেলের শাটল বাস আমাদেরকে পৌঁছে দিলো এয়ারপোর্টে। প্লেনের জানালা দিয়ে তুষার ঢাকা পাহাড়, নীলচে ফিয়র্ড আর কুয়াশায় মোড়া উপত্যকা যেন বিখ্যাত কোনো শিল্পীর আঁকা পেইন্টিং-এর মতোই মনে হলো। বার্গেন শহরে পৌঁছে রঙিন কাঠের ঘরগুলো দেখে পাহাড়ের গায়ে কেউ যেন রূপকথার দৃশ্য এঁকে রেখেছে বলেই মনে হলো।

পরদিন ভোরে নৌকায় চড়ে আমরা বেরোলাম ফিয়র্ড ভ্রমণে। স্বচ্ছ জলে পাহাড়ের প্রতিবিম্ব, আকাশের ভেসে থাকা তুলোর মতো মেঘ, আর সেই অনন্ত নীরবতা মন কেমন করে উঠল। সবচেয়ে বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা হলো 'মিডনাইট সান' ঘড়ির নিয়মে রাত হলেও যখন দেখলাম সূর্য অস্ত যাবার নামটি নেই, আলো ছড়িয়ে পড়ছে পাহাড়ে, জলে আর নীল আকাশে। সময় যেন থমকে গেলো! মন চাইছিলো সেই মুহূর্তে আটকে থাকতে।

ফিনল্যান্ড: এক শান্তির ঠিকানা

নরওয়ের শীতল সৌন্দর্য পেরিয়ে আমরা এলাম ফিনল্যান্ডে। প্রশস্ত রাস্তা, গাছগাছালিতে ভরা, আর মানুষের কণ্ঠস্বরও যেন নরম-মোলায়েম সেখানে। সমুদ্রের ধারে ছোট ক্যাফেগুলোয় বসে স্থানীয়রা ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছে কফিতে— সেও যেন দেখে মনে হলো ছবির মতো!

প্রায় দু'শ কিলোমিটার ড্রাইভ করে আমরা চলে গেছিলাম নরওয়ে থেকে ফিনল্যান্ডের একেবারে উত্তরের কোণে, ল্যাপল্যান্ড অঞ্চলে অবস্থিত ছোট্ট ও নিরিবিলি গ্রাম কিল্পিসজার্ভী (Kilpisjärvi)-তে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা এই গ্রামটি ঘন বন, হিমবাহ আর শান্ত হ্রদের মাঝে অবস্থিত, যা ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য এক স্বর্গভূমি।

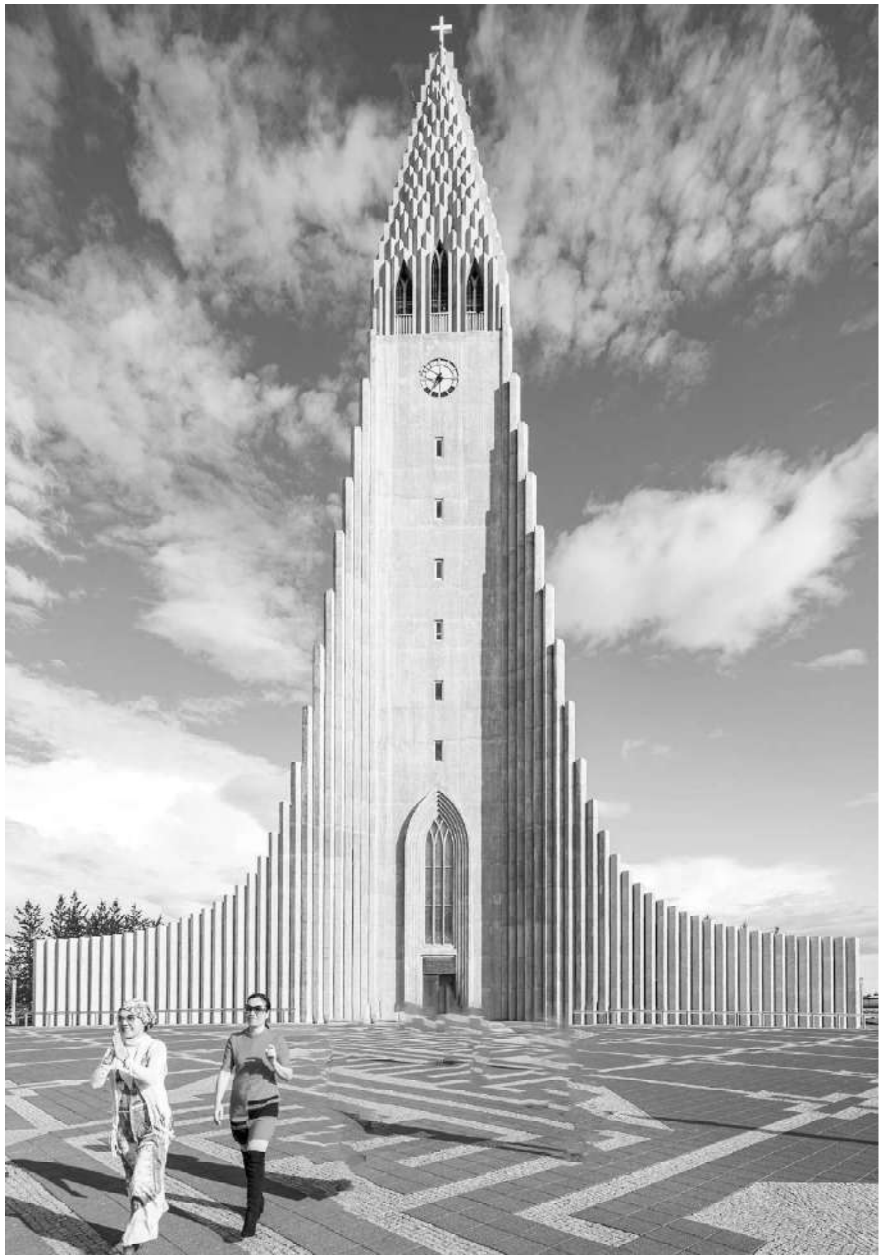

ইউরোপের একটি দেশ আইসল্যান্ড। প্রকৃতির কোলে অত্যন্ত সুন্দর এই দেশের রাজধানী রেকিয়াভিকে রয়েছে এই সুন্দর চার্চটি। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটকের ভিড়ে এই শহর আজ ব্যস্ততম শহরের একটি। জুন - জুলাই মাসে এখানে দিনের আলো থাকে ২৩ ঘণ্টা।

এখানকার সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থানগুলোর একটি হলো 'থ্রি কান্ট্রি কেয়ার্ন' (Three-Country Cairn) যেখানে একসঙ্গে ফিনল্যান্ড, নরওয়ে এবং সুইডেনের সীমান্ত মিলেছে। এটি এমন একটি বিরল স্থান, যেখানে এক পা ফিনল্যান্ডে রেখে অন্য পা সুইডেন অথবা নরওয়েতে রাখতে পারা যায়!

ছোট দ্বীপের মতো একটি গোলাকার পাথরের স্তম্ভ দ্বারা সেই জায়গাটিকে চিহ্নিত করা রয়েছে।

সমুদ্রের তীর পেরিয়ে একটি রাস্তায় আমরা যখন থামলাম আর, আমাদের গাড়ি কোথায় পার্ক করবো, সে নিয়ে যখন আমরা চিন্তায় পড়েছি— তখন এক মহিলাকে পেলাম সাথে একটি বিশাল কুকুর নিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। জনহীন ওই জায়গায় একজনকে দেখেই আমরা তখন খুশি। ওর কাছ থেকেই আমরা জানতে পারলাম 'থ্রি কান্ট্রি কেয়ার্ন'-এ পৌঁছাতে হলে আমদেরকে হাঁটতে হবে প্রায় ১১ কিলোমিটার পথ, যা তুন্দ্রার মাঝ দিয়ে সুন্দর এক ট্রেইল। পথের শেষে একটি পাহাড় চূড়া থেকে তিনটি দেশকে একসঙ্গে দেখতে পাবো আমরা।

হাইকিং আমাদের তিনজনেরই খুব প্রিয়। সেভাবে প্রস্তুত না থাকলেও এক কথায় রাজি হয়ে গিয়ে শুরু করে দিলাম হাঁটা। সে ছিল এক অনন্য অনুভূতির ইচ্ছে-পূরণের পথ! মুগ্ধ হলাম পাহাড়ের চূড়া থেকে তিনটি দেশের মিলিত স্থানটি দেখতে পেয়ে। স্বপন প্রচুর ছবি তুললো। গ্রীষ্মে এখানকার সূর্য প্রায় অস্তই যায় না। এই জায়গাটিকে তাই আরও রোমাঞ্চকর বলেই মনে হলো।

হাইকিং শেষে গাড়িতে ফিরে এসে শুরু হলো আমাদের ক্যাফেটেরিয়া সন্ধান। জনবিরল এই গ্রামে তাজা বেরি আর গরম গরম স্যুপের সন্ধান মিললো খুব সহজেই। কিন্তু আমাদের মন থেকে লুকিয়ে উঁকি মেরে চলেছে তখন ধোঁয়া ওঠা এক কাপ কফি। অবশেষে গুগল খুঁজে দিলো সুন্দর, মনোরম এক ক্যাফেটেরিয়া। যা আমাদের ক্লান্ত শরীর ও মনকে জড়িয়ে ধরল তার উষ্ণতা আর সুবাসে। তারপর, আরও কিছুক্ষণ সময় সমুদ্রের ধারে হাঁটতে হাঁটতে মনে হলো, এমন দেশই হয়তো মানুষের মনের ভেতরের সমস্ত কোলাহল মুছে শুধু প্রশান্তিতে ভরিয়ে দেয় মনকে।

সুইডেন: জলঘেরা রূপকথার শহর

ফিনল্যান্ড থেকে ট্রমসোতে ফেরার পথে আমি ড্রাইভ করলাম অনেকটা পথ। বাকি দু'জনের তখন বিশ্রাম। পরদিন সকালের ফ্লাইটে আমরা সুইডেন যাবো। আকাশ থেকে গোটা স্টকহোমকে দেখে মনে হলো আমরা যেন ভেসে চলেছি জল আর দ্বীপের কোনো স্বপ্নদেশে। শহরের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য দ্বীপ, আর সেগুলো সেতুর বাঁধনে একে অপরের সাথে যুক্ত। অপূর্ব সে এক দৃশ্য !

প্রথম এয়ারপোর্ট থেকে আমরা সোজা চলে গেলাম আমাদের রিজার্ভ করা airbnb তে। সেখানে লাগেজ রেখে আমরা বেরিয়ে পড়লাম স্টকহোম শহর দেখতে। গামলা স্তান-এর সরু পাথুরে গলিপথে হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম রাজপ্রাসাদের সোনালি ঝলক। ভাসা মিউজিয়ামে গিয়ে ১৭শ শতাব্দীর যুদ্ধজাহাজ দেখে মনে হলো সময় যেন পিছিয়ে গেছে কয়েক শতাব্দী। খালের ধারে বসে গরম কফি আর দারচিনির গন্ধে ভরা সিনামন বান খেতে খেতে তুতাই বলল, 'এ শহর তো রূপকথার বই থেকে উঠে এসেছে।' ওর চোখে সেই বিস্ময় দেখে মনে হলো, ভ্রমণ সত্যিই আমাদের নতুন চোখ দেয় পৃথিবীকে দেখার।

সেখান থেকে আমরা গেলাম স্টকহোমের Djurgarden এ। সেখানে রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত সুইডিশ পপ ব্যান্ড Abba The Museum. Abba-র যে গানগুলো শুনে বড় হয়েছি, মিউজিয়ামটিতে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আর সেখানে বাজতে থাকা আব্বার গানগুলো শুনতে শুনতে মনে হলো সেই গানগুলোর সাথে আমার পুরোনো দিনগুলোও যেন জীবন্ত হয়ে ফিরে এসেছে। সে এক অসাধারণ তৃপ্তি।

অস্ট্রিয়া: ভিয়েনার সুরে মুগ্ধতা

স্টকহোমের ঠান্ডা হাওয়া পেরিয়ে পৌঁছিলাম ইউরোপের সুরের শহর ভিয়েনা। তবে তার আগে আমরা কিছুদিন থাকলাম সালবুর্গ শহরে। রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ির চলাচলের টকটক শব্দ, আকাশে ভেসে আসছে মোৎজার্টের সুর— পুরো শহরটাই যেন এক বিশাল মঞ্চ। মোৎজার্টের জন্মস্থান দেখতে গেলাম। দেখলাম মোৎজার্টের বাড়ি। সবই এখন জাদুঘর। আমরা যারা সংগীতপ্রেমী, তাদের জন্য অবশ্যই এটি একটি দর্শনীয় স্থান।

এই শহর দেখার স্বপ্ন আমার বহু বছরের। এখানেই আমার চিরদিনের প্রিয় মুভি 'সাউন্ড অফ মিউজিক' তৈরী হয়েছিল। এই মুভিটি যে কতবার দেখেছি, তার কোনো হিসেব নেই।

ভিয়েনার শ্যেনব্রুন প্যালেসের মন-মুগ্ধ করা সোনালি অলঙ্করণ আর ফুলে ভরা বাগান যেন ইতিহাসের মুকুট। সন্ধ্যায় অপেরা হাউসে কনসার্ট শুনে মনে হলো সুর যেন হৃদয়ের ভেতর ঢুকে গিয়ে তাকে আলোকিত করে তুলছে।

আরও একটি জিনিস না বললেই নয়। ওখানকার রাস্তার বেকারি থেকে আসা গরম স্টুডেলের গন্ধও রাতের ভিয়েনাকে করে তোলে আরও মধুর।

হাঙ্গেরি: ড্যানিউবের তীরের অচেনা দেশে

অস্ট্রিয়ার সালবার্গ থেকে রেন্টাল গাড়ি ড্রাইভ করেই আমরা চলে গেছিলাম ইউরোপিয়ান আরেকটি দেশ হাঙ্গেরিতে। যেন গল্পের মতো করে সাজানো এই ছোট্ট শহর। শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে ইউরোপের অন্যতম প্রধান নদী ড্যানিউব এবং এর একটি উপনদী Leitha/Lajta. দূর থেকে ওখানে চোখে পড়ে অনেক সেতু। সেই সেতুগুলোই আশেপাশের দেশগুলোর সাথে যোগাযোগকে সহজ করে দিয়েছে।

আমরা চলে গেছিলাম প্রকৃতির নিজের হাতে যত্ন করে সাজানো শহর Hegyeshalom এ। এখানকার St. Michael's Church একটি পুরোনো গথিক স্টাইলের গির্জা। এটি প্রায় ১২শ শতকে নির্মিত ও স্থানীয়দের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক জীবনের অংশ।

ছোট শহর হলেও স্থানীয় ক্যাফেগুলোয় প্রাণচাঞ্চল্য ভরা। এক কাপ গরম কফি হাতে নিয়ে বসে দূরে তাকিয়ে দেখছিলাম হাঙ্গেরির মাটি যেন ভিন্ন রঙে মোড়া।

সন্ধ্যায় এখানকার শহরে জ্বলে ওঠা সোনালি আলো নদীর জলে ঝিলমিল করে, যেন আকাশের তারা জলে নেমে এসেছে। রাতে ড্যানিউবে আলো আর জলের মিলনে তৈরি হলো এক নিখুঁত কবিতা— যা আমাদের ভ্রমণের আনন্দকে সে রাতে পৌঁছে দিলো এক নিবিড় পূর্ণতায়।

জার্মানি: আল্পসের কোলে শহর মিউনিখ

হেগিয়েশালোম থেকে আমরা পৌঁছালাম মিউনিখে। আল্পস পর্বতের

উত্তরে অবস্থিত মিউনিখ হলো জার্মানির বাভারিয়া প্রদেশের রাজধানী এবং একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক শহর।

শহরের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে থাকা মারিয়েনপ্লাৎস চত্বর যেন শহরের প্রাণ। চারপাশে রঙিন বাড়িঘর, দোকান আর ক্যাফে। মিউনিখ তার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, আধুনিক প্রযুক্তি এবং ঐতিহ্যবাহী নানা উৎসবের জন্য বিশ্বব্যাপী পরিচিত। এছাড়া মিউনিখ হলো BMW, Allianz, Siemens এর মতো বিশাল কোম্পানির কেন্দ্র।

আমরা রেসিডেন্স প্যালেস ঘুরে দেখলাম। সোনালি সজ্জা, বিশাল হলঘর আর শিল্পকর্মে ভরা দেয়াল যেন বাভারিয়ার ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি। অপেরা হাউসের স্থাপত্য এত সুন্দর যে শুধু তাকিয়েই সময় কেটে যায়। সন্ধ্যায় চত্বরে বসে সঙ্গীত শিল্পীদের পরিবেশনা শুনতে শুনতে মনে হলো, এ শহর কেবল ইতিহাসে নয়, সুর ও শিল্পে বেঁচে আছে।

স্লোভাকিয়া: ব্রাটিস্লাভার দুর্গে আমরা

মিউনিখ থেকে ড্রাইভ করে আমরা পৌঁছালাম ব্রাটিস্লাভায়। শহরের উপরে পাহাড়চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে ব্রাটিস্লাভা ক্যাসল (Hrad) সাদা রঙের প্রাসাদ, চার কোণে চারটি টাওয়ার, যেন আকাশের সঙ্গে কথা বলছে। এটি একসময় হাঙ্গেরির রাজাদের আবাসস্থল ছিল। সেখান থেকে দানিউব নদী আর শহরের রঙিন ছাদগুলো দেখে মনে হলো যেন ক্যানভাসে আঁকা ছবি। ছোট্ট শহর, কিন্তু গল্পে ভরা। রঙিন বাড়ি, ফুলে সাজানো জানালা আর শান্ত গলি যেন ভ্রমণকারীর ক্লান্তি দূর করে দেয় নিমেষে।

এই প্রাসাদটির প্রথম নির্মাণকাল ৯ম শতকে। তবে বর্তমানের রূপটি ১৬শ শতকের। প্রাসাদের ভেতরে স্লোভাকিয়ার ইতিহাসের নিদর্শন দেখে মুগ্ধ হলাম। বর্তমানে এটি স্লোভাক ন্যাশনাল মিউজিয়াম।

নীচে নেমে বাজারে স্থানীয় মিষ্টি 'ট্রডেলনিক' খেলাম। গরম, নরম, দারচিনির গন্ধে ভরে উঠল চারপাশ। পর্যটকের ভিড় কম এখানে, কিন্তু সৌন্দর্যে ভরা এই শহর আপন করে নিল আমাদের মন।

নেদারল্যান্ড: আমস্টারডামের নদীপথের গান

শেষ গন্তব্য আমস্টারডাম! এই শহরটিকে মাত্র কয়েকটি উপমায় খুব সুন্দর বুঝিয়ে দেওয়া যায়। সাইকেলের শহর, নদীপথ বা খালপথ আর টিউলিপের দেশ— এই শব্দগুলো আর কিছু না বলেও আমস্টারডামকেই বোঝায়। সরু সেতু আর পথ, রঙিন বাড়ি আর জলে তাদের প্রতিবিম্ব এই সবকিছুতেই ছড়িয়ে রয়েছে এক অদ্ভুত শান্তি, আর সৌন্দর্য।

টিউলিপের রঙিন সমুদ্র দেখে মনে হলো বসন্তের দেবতা যেন নিজেই তুলি ডুবিয়ে পুরো মাঠে রঙ ছড়িয়ে দিয়েছেন। খালে নৌকা ভ্রমণ শেষে ভ্যান গগ মিউজিয়ামে গিয়ে রঙ আর ক্যানভাসের ভেতর হারিয়ে গেলাম। শহরের ব্যস্ততা সত্ত্বেও, খালের ধারের সন্ধ্যা যেন শান্তির চাদরে মুড়ে দিল আমাদের ভ্রমণের শেষ দিনগুলো।

আটটি দেশ, আট রঙের স্মৃতি, নরওয়ের মধ্যরাতের সূর্য থেকে শুরু করে আমস্টারডামের খালের গানে শেষ, প্রতিটি মুহূর্ত যেন একেকটি রত্ন হয়ে মনের ঝুলিতে জমে রইল। এই ভ্রমণ শুধু দূরের দেশ দেখা নয়, বরং একসাথে হাঁটা, হাসা, বিস্মিত হওয়া আর নতুনকে আপন করে নেওয়ার গল্প। সময় হয়তো ফিরে আসবে না, কিন্তু এই অভিজ্ঞতা, এই সৌন্দর্য আর আমাদের হাসিমাখা ছবিগুলো চিরকাল থেকে যাবে হৃদয়ের গভীরে, এক মিষ্টি আলো হয়ে।

আটটি দেশের পথে যতটুকু হাঁটলাম, ততটুকুই যেন নিজেকে নতুন করে চিনে নিলাম। নরওয়ের ফিয়র্ডে ভেসে থাকা নীরবতা, ফিনল্যান্ডের শান্তির উষ্ণ আলিঙ্গন, স্টকহোমের জলঘেরা রূপ, ভিয়েনার সুরের নেশা, হাঙ্গেরির দানিউবের আলো, ব্রাটিস্লাভার সরল সৌন্দর্য আর আমস্টারডামের নদীপথের শান্তি— সব মিলেমিশে যেন এক সিম্ফনি হয়ে বাজছে আমার মনে।

ভ্রমণ শেষ হয়, কিন্তু স্মৃতি কখনও শেষ হয় না। সেই স্মৃতিগুলোই আমাদের জীবনের রঙ, যা একদিনের ক্লান্ত বিকেলে হঠাৎ চোখে ভেসে ওঠে, আর মনে করিয়ে দেয় পৃথিবী কত সুন্দর, আর পরিবারের সাথে একসাথে পথ চলা কতটা আশীর্বাদ।

ভিয়েনার মনোমুগ্ধকর ভেলভিডিয়ার প্রাসাদ

স্লোভাকিয়ার ব্রাটিস্লাভা ক্যাসেল

স্বাধীন ভারতে সংবাদপত্রে ব্রিটিশ আইন

সুবল কুমার দে

মানবসভ্যতার বিকাশের সাথে সাথেই সমাজবদ্ধ মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে তার স্বাধীন মতামত প্রকাশ ও প্রচার করতে চেয়েছে। অন্যদিকে প্রকাশকগণ সমাজের হিতের দোহাই পেড়ে মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে নানাভাবে রুদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে আসছে। এদেশেও সংবাদপত্রকে বহিরাবণের মতো জন্মলগ্ন থেকে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে যেতে হচ্ছে— সে রাজতন্ত্রই হোক, গণতন্ত্রই হোক বা মেলাতন্ত্রই হোক। কোন শাসকই সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা মেনে নিতে পারে না। ভারতে ব্রিটিশ রাজতন্ত্র থেকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পর্যন্ত একই চিত্র বারবার লক্ষ্য করা যায়। কী কেন্দ্রীয় স্তরে, কী রাজ্য স্তরে— সর্বত্র সংবাদপত্রকে চাপের মুখে রাখার জন্য আইনের শেকল তৈরি হয়। এ নিয়ে স্বাধীনতাকামী মানুষের সাথে রাজশক্তির বারবার সংঘাত বেঁধেছে। আজও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু সংবাদপত্রের উপর তাদের জারি করা আইনগুলো স্বাধীন ভারতেও স্ব-মহিমায় বিরাজ করছে। শুধু তাই নয় স্বাধীন ভারতে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শুরু করে প্রাদেশিক সরকারগুলো পর্যন্ত নানাভাবে আইনি বেড়াজাল সৃষ্টি করে রেখেছে। আজ পর্যন্ত ভারতের সংবিধানের মধ্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন রক্ষাকবচ রাখা হয়নি।

এদেশে সংবাদপত্রের উপর সরকারি হস্তক্ষেপ শুরু হয় ১৭৯৯ সালেই। এর আগে সংবাদপত্রের উপর, সংবাদপত্রের মত প্রকাশের উপর কোন সরকারি বিধিনিষেধ চালু ছিল না। সংবাদপত্রগুলো ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন।

ফ্রান্সের সাথে ইংল্যান্ডের যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার পরই লর্ড ওয়েলেসলি প্রথম সংবাদপত্রের উপর সরকারি বিধি নিষেধ চালু করেন। অবশ্য শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোই প্রথম বিধি নিষেধের আওতায় আসে। ১৮১৩ সালে মারকুইজ হেস্টিংস ক্ষমতায় আরোহণ করার পর সংবাদপত্রের উপর লর্ড ওয়েলেসলির জারি করা ফরমানগুলো প্রত্যাহার করে নিয়ে সংবাদপত্রের সম্পাদকদের কিছু আচরণবিধি তৈরি করে দেন। জনস্বার্থহানি হতে পারে বা দাঙ্গার কারণ সৃষ্টি হতে পারে, এমন কোন সংবাদ বা নিবন্ধ প্রচার থেকে বিরত থাকতে সম্পাদকদের নির্দেশ দেওয়া হয় তখন। মারকুইজ হেস্টিংসের উদার সংবাদপত্র নীতি চালু হয় ১৮১৮ সালের ১৯ আগস্ট। হেস্টিংস সংবাদপত্রের উপর এই উদার বেড়িও পরাতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের চাপে তাঁকে পিছু হঠতে হয়। বিশেষ করে তৎকালীন মুখ্যসচিব জন অ্যাডাম যা হেস্টিংসের উদার সংবাদপত্র নীতি মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেননি। যার ফলেই উদারনীতি খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। পারিষদবর্গের সাথে বনিবনার অভাবে মারকুইজ হেস্টিংস ১৮২৫ সালের ১লা জানুয়ারি গভর্নর জেনারেল পদে ইস্তফা দেন। তখন জন অ্যাডাম অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল পদে মনোনীত হন। তখন থেকে সংবাদপত্র দখলনীতি পাকাপাকিভাবে শুরু হয়ে যায়।

১৮২৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর জন অ্যাডাম সুপ্রিম কোর্টের কাছে সংবাদপত্রকে শেকল পরিয়ে রাখার জন্য একগুচ্ছ প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবে বলা হয়, সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র প্রকাশ করতে হলে সরকারের কাছে প্রথমেই রেজিস্ট্রি ভুক্তির জন্য আবেদন করতে হবে। সরকার লাইসেন্স প্রদান করলেই প্রকাশক তা প্রকাশ করতে পারবেন। প্রকাশককে তার নামধাম ঠিকানা ও সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়ে অ্যাফিডেভিট করতে হবে। যদিও তৎকালে ভারতের বিশেষ করে বাংলার সংবাদপত্র প্রকাশক ও সম্পাদকরা একযোগে সরকারি প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি স্যার ফ্যানসিসের কাছে স্মারকপত্র দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে বিচারপতির মন গলেনি। জন অ্যাডামের প্রস্তাবগুলো কার্যকর করেন বিচারপতি স্যার ফ্যানসিস। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে যারা

স্মারকপত্র দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, গৌরচন্দ্র ব্যানার্জী, চন্দ্রকুমার ঠাকুর প্রমুখেরাও ছিলেন।

স্বাধীন ভারতে আজও সেই আইনগুলো বর্তমান। সংবাদপত্র প্রকাশ করতে গেলে আজও জন অ্যাডামের নীতিগুলো পুরোপুরি পালন করতে হয়। ব্রিটিশ শাসক হেস্টিংস পরাধীন ভারতের সংবাদপত্রের প্রতি যে উদারতা দেখাতে পেরেছিলেন, স্বাধীনোত্তর ভারতের রাষ্ট্রনায়করাও সেই উদারতা দেখাতে পারেননি। হেস্টিংস তার উদার সংবাদপত্র নীতিতে সংবাদপত্রের সম্পাদকদের বিচারবুদ্ধি, বিচক্ষণতার উপরই রচনা বাছাই'র দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। হেস্টিংস সংবাদপত্র সম্পাদকদের শ্রদ্ধাও করতেন এবং তাদের বিচারবুদ্ধির উপর আস্থা রাখতেন। হেস্টিংসের শাসনকালে কোন সংবাদপত্র সম্পাদকই তার নির্দেশের অমর্যাদা করেননি। হেস্টিংসের আদেশে বলা হয়েছিল— 'Relying on the prudence and discretion of the editors for their careful observance of these rules, the Governor General in Council is please to dispence with their submitting their papers to an officer of Government previous to publication. The editors will however, be held personally accountable for what ever they may publish in the contravention of the rules now commited or which may be otherwise at varience with general principles of British law as establish in this Country, and will be proceded against in such manner as the Governor General in Council may deem applicable to the nature of the offence for any deviation from them.'

হেস্টিংসের এই নির্দেশই পরে বিভিন্নভাবে সংশোধন করে আরো কড়াভাবে সংবাদপত্রের উপর দখলনীতি চালু হয় এদেশে। জন অ্যাডাম সংবাদপত্র দখলনীতি খসড়া রচনা করে 'অ্যাডামসগ্যাগ' নামে কুখ্যাত হয়েছিলেন। জন অ্যাডাম প্রবর্তিত আইন ভাঙার জন্য তৎকালে অনেক সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। অনেকের ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত হয়। কাউকে দেশচ্যুত করা হয়। অর্থ জরিমানা করে দেউলিয়া খাতায় নাম লেখানো হয়।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে মত প্রকাশের অধিকারকে অনিশ্চিত করার পরও রাষ্ট্রীয় শাসকবর্গ সংবাদপত্রে মত প্রকাশের অধিকারকে সঙ্কুচিত করার জন্য নানা আইনি বেড়াজাল বিস্তার করেন। তার মধ্যে রয়েছে, প্রেস আইন ১৯৫১, পুস্তক ও সংবাদপত্র সরবরাহ আইন ১৯৫৪, আপত্তিকর বিজ্ঞাপন আইন ১৯৫৪, সংবাদপত্র নিবন্ধভুক্তকরণ আইন ১৯৫৬, ফৌজদারি বিধি সংশোধন আইন ১৯৬১, আদালত অবমাননা আইন, প্রেস পরিষদ আইন ১৯১৫, কেন্দ্রীয় প্রেস সেন্সরশিপ আইন ১৯৭৫, আপত্তিকর বিষয়বস্তু প্রকাশ প্রতিরোধ অধ্যাদেশ ১৯৭৬, প্রেস পরিষদ (বাতিল) আইন ১৯৭৬, সংসদীয় কার্যবিবরণী প্রকাশের অধিকার হরণ ১৯৭৬। তাছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যসমূহে সংবাদপত্র সাংবাদিকদের অধিকার হরণ সম্পর্কিত আইন চালু রয়েছে।

সংবিধানের মত প্রকাশের বিষয়টি মেনে নেয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে নানা আইনি জালে মত প্রকাশের স্বাধীনতা শেকলবন্দি। রাজপুরুষদের কুকীর্তির বিরুদ্ধে সংবাদপত্র তথা মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী মানুষ যখনই প্রতিবাদী হচ্ছে, তখনই সংসদীয় কক্ষে দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংবাদপত্রকে টাইট দেয়ার বিধান তৈরি হয়েছে। এদেশীয় রাজনীতিকরা মুখে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে কোন রাজনীতিকই সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন না। বিরোধী দলে থাকাকালীন সময়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য প্রতিবাদী ভূমিকা নিলেও, শাসন ক্ষমতায় আরোহণ করলে এদের আসল চরিত্রটা ধরা পড়ে যায়। স্বাধীন সংবাদপত্র সরকারের কাছে, ক্ষমতাসীনদের কাছে আপদ ছাড়া আর কিছু নয়। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংবাদপত্রগুলো স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে চাইলেই বিপদ ঘনিয়ে আসে। প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই এসব ঘটনা ঘটছে।

প্রেস কাউন্সিল, এডিটরসগিল্ড, ইন্ডিয়ান নিউজ পেপার সোসাইটি প্রভৃতি সংগঠনে প্রায়ই রাজ্যগুলো থেকে সরকারি ব্যাভিচারের অভিযোগ আসে। অথচ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অপরিহার্য। রাজনীতিকরা মসনদে আরোহণ করেই এ কথাটা ভুলে যান। স্বাধীন সংবাদপত্রকে টাইট দিতে আইনি বে-আইনি পথে অগ্রসর হন। ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরাও এসব ব্যাভিচার থেকে মুক্ত নয়। এখানেও সরকার বদল হলে প্রতিপক্ষের উপর আঘাত নেমে আসে।

HICKY's
BENGAL GAZETTE;
OR THE ORIGINAL
Calcutta General Advertiser.

VOL. III] A Weekly Political and Commercial Paper, Open to all Parties, but influenced by None.

From Saturday March the 16th to Saturday March the 23d. 1782. [No. IX

INTELLIGENCE EXTRAORDINARY FROM THE NEW JOCKEY CLUB.

A NEW and most extraordinary Race is, to be run on the Calcutta Race Groundin a very few days, for one Lack and a half of Rupees, pay or play, No crossing or justling between Little Charley Bullock and that delicate Jockey Paddy Wh.R. Charley being rather light weight, the knowing ones have given it as their opinion that he should carry weight it is therefore decreed that Charley shall carry a large Beefty on his back

December 1781.

THE Ketch Cuddah Bux arrived at Bombay from the African Coast, the 9th instant, Commanded by Nequedah Sully Mahomet.

She left Bomby the 19th March and arrived at Delagoa the 3d. June, and found two Snows belonging to Mr. Bolts, one had come from the West Coast, and the other from Bombay, both Commanded by Englishmen.——After being there about Twenty Days, a French Ship of 20 Guns, Manned with Europeans arrived. On board of her were Shott,

having a matter of consequence to relate to him--accordingly the Capt. came ashore and waited on the Gov.

When the following Questions was put to him.—

Q. What were your Reasons for going on board the Ketch, and to search her Papers?—

A. To ask the news, from whence she came, and if she was Moor or English property.—

Q. What authority had you to that, in a Neutral Port, had she been English property.—

A. I did it for my own pleasure and satisfaction.—

বেঙ্গল গেজেট বা হিকির বেঙ্গল গেজেট ছিল ভারতের কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা। এটি ছিল ভারতের প্রথম প্রধান পত্রিকা যা ১৭৮০ সালের ২৯শে জানুয়ারি যাত্রা শুরু করে। এটি দুই বছর পর্যন্ত প্রকাশ হয়েছিল।

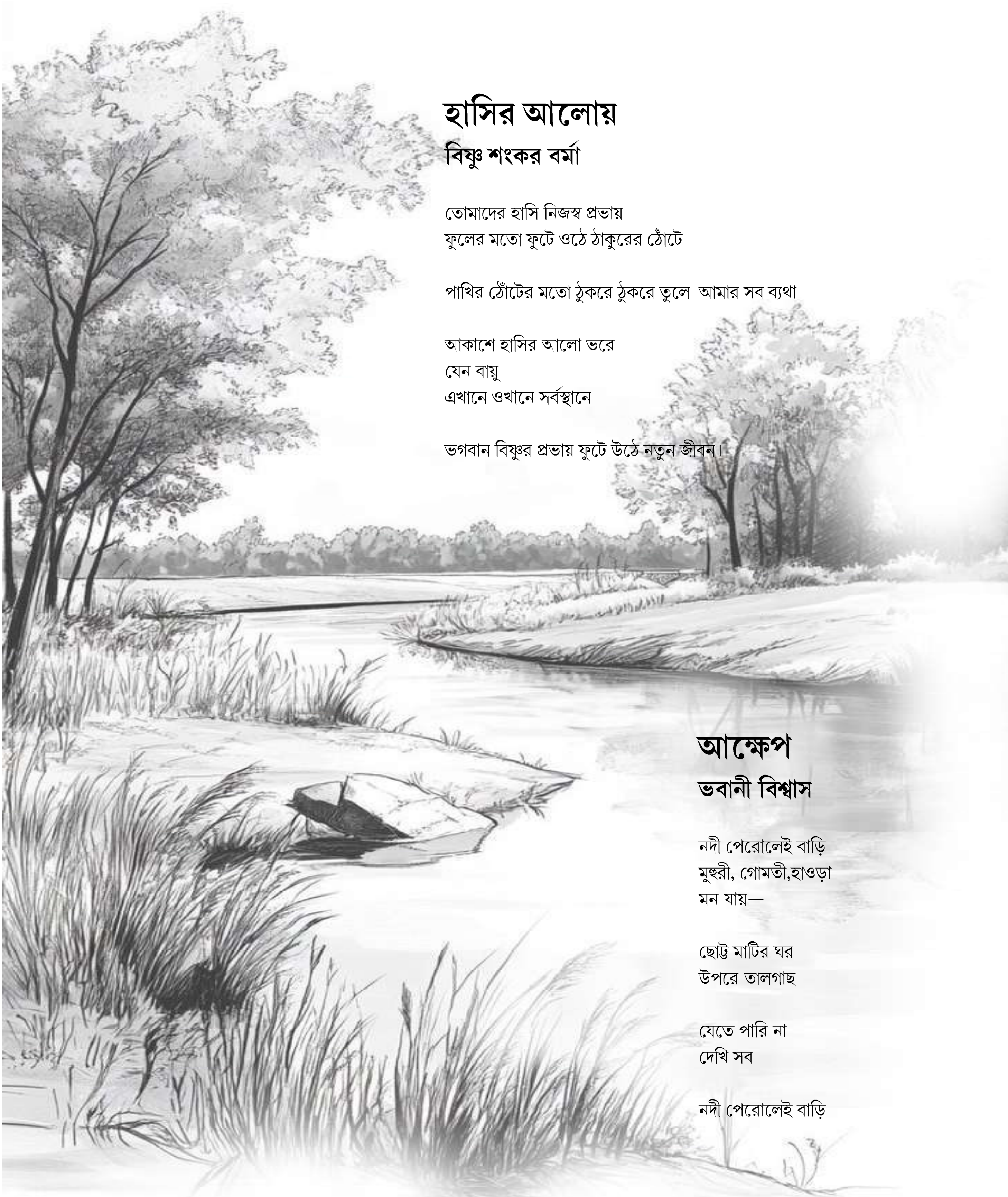

হাসির আলোয়

বিষ্ণু শংকর বর্মা

তোমাদের হাসি নিজস্ব প্রভায়
ফুলের মতো ফুটে ওঠে ঠাকুরের ঠোঁটে

পাখির ঠোঁটের মতো ঠুকরে ঠুকরে তুলে আমার সব ব্যথা

আকাশে হাসির আলো ভরে
যেন বায়ু
এখানে ওখানে সর্বস্থানে

ভগবান বিষ্ণুর প্রভায় ফুটে উঠে নতুন জীবন।

আক্ষেপ

ভবানী বিশ্বাস

নদী পেরোলেই বাড়ি
মুহুরী, গোমতী,হাওড়া
মন যায়—

ছোট্ট মাটির ঘর
উপরে তালগাছ

যেতে পারি না
দেখি সব

নদী পেরোলেই বাড়ি

"In The Kingdom Of Ghosts"

Sanjeev Singha

The sky is empty;
No birds- could I see
But ghosts of clouds fly
Filling the air with their cry.

The air is chilly cold;
No breath- could I behold
But flakes of thick spray-
Mist the earth in fur of gray.

The earth is barren;
No beast- could I ken
But ghosts of men walk
Lonely, shrieking in the dark.

The heart is parch-dry;
No ethics-could I spy
But ghost of humanity
Loiter in shadows of ignominy.

It's the land of ghost,
Where might is the host
And the children of penury
Is breeding ghosts of perjury.

In the land of ghost,
Where few rules the most,
The ghost of democracy
Shriek and wail for mercy.

Deprivity

Agrata Deb

I can hear
I can see
I can bear
In hope
That one day
I'll let it be free

I can kill
I am killed
I can loose
With the lust of win

I can grieve
I can love
Even if i know
what is war

I can rule
I am ruled
I can sing
Even if the don't hear
Until it turns into screams

I can see my dreams
Devoured by flame
Crushed and grind
Yet I am deaf
Yet I am lame
Yet I am blind

জানালার ওপারে

ড. চন্দন সাহা

কর্ণপুর শহরের পূর্ব দিগন্তে চুপচাপ জমে উঠেছিল কালচে মেঘ, যেন আকাশও কোনো পুরনো স্মৃতির ভারে বোঝা হয়ে পড়েছে। পাহাড়ি শহরটির চারপাশে ছড়িয়ে থাকা পাইন ও শাল গাছের ফাঁক গলে দেখা যায় এক ধূসর অতীত পটেশ্বরী রাজবাড়ি। কালের ক্ষয় আর অবহেলার ধুলো-মাখা মুখে দাঁড়িয়ে সে যেন এক প্রাচীন অভিজাতের ক্লান্ত নীরবতা। ভাঙাচোরা পাঁচিলের গা বেয়ে উঠে আসা আগুনলতা তার শরীরে যেন জড়িয়ে দিয়েছে অবিনাশী এক কুঞ্জপালবিক চাদর। ইমারতের বারান্দায় ঝরে পড়া রোদ আজও পড়ে সেই পুরনো স্থির ভঙ্গিমায়, ঠিক যেমন করে পড়ত শতাব্দী আগে, তখন যখন এই প্রাসাদে বাজত শঙ্খ, উঠত ধূপধুনোর গন্ধ, আর চকচকে দরবারে প্রতিধ্বনিত হতো রাজবংশের গম্ভীর স্বর। এখন সেখানে কেবল সময় থেমে থাকে এক অচঞ্চল, অলিখিত অভিমান নিয়ে।

ঈহান ঘোষ কর্ণপুর শহরের নিঃশব্দ এক পথচারী, যাকে শহর চেনে কেবল তার ক্যামেরার চোখ দিয়ে। মানুষের মুখ নয়, সে খোঁজে দেওয়ালের দাগ, কাচে প্রতিফলিত একাকিত্ব, আর আলো-ছায়ার মিতালিকে। সেদিন বিকেলে রোদ ছিল কিছুটা ধুলোছোঁয়া, বাতাসে কেমন নিস্তব্ধতা। এমন সময়, ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে সে ঢুকে পড়ল পটেশ্বরী রাজবাড়ির ফটকে। তার চোখে ছিল অন্বেষণ, আর মনে ছিল একটাই ভাবনা 'আবছা কিছু ফ্রেম চাই আজ। রঙিন দৃশ্য নয়, কেবল অতীতের ছায়া, আলোর হিমস্পর্শে ফিকে হয়ে যাওয়া ইতিহাসের মুখ।'

ফটকের লোহার দরজা একটু কেঁপে উঠতেই রাজবাড়ির প্রশস্ত বারান্দার দিক থেকে বেরিয়ে এল এক নারী। ধূসর নীল কুর্তি গায়ে, এক হাতে হিমজলের স্বচ্ছ বোতল, আর চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা তার চলন ধীর, অথচ গম্ভীর। ঈহানের চোখ যেন ঠিক সেখানেই থেমে গেল। তার চেনা লাগে না, অথচ মনে হলো এই নারী যেন বহু পুরনো কোনো ফ্রেম থেকে হেঁটে আসছেন সামনে।

তারপরেই মনে পড়ল তিনি বেণুরেখা ধর। সদ্য কলকাতা থেকে আসা এক হেরিটেজ গবেষক। তার কাজ পটেশ্বরী রাজবাড়ির গোপন ও উপেক্ষিত ইতিহাস ঘেঁটে নতুন আলো ফেলা।

ঈহানের মনে অজান্তেই একটি চিত্র গড়ে উঠল আলো-ছায়ায় ঘেরা এক নারী, যাকে ক্যামেরা দিয়ে ধরা যায়, কিন্তু পুরোপুরি বোঝা যায় না।

'তুমি?' ঈহানের স্বর যেন স্তব্ধ এক নদীর ওপর হঠাৎ নেমে আসা ঝড়ো হাওয়ার মতো। সাবধান, চাপা, আর একরাশ বিস্ময়ে আচ্ছন্ন।

'হ্যাঁ, আমি,' বেণুর কণ্ঠে সেই পুরনো শীতলতা, যেন অতীতের এক পাথর তুলে আছড়ে ফেলেছে বর্তমানের বুকে। 'রিসার্চ করছি। হেরিটেজ বোর্ডের অনুমতিসহ এসেছি। সরকারি কাজ, রেকর্ডসহ। আর তুমি?'

'ছবির খোঁজে', ঈহান ধীর ভঙ্গিতে তার ক্যামেরাটা দেখাল। 'আলো আর

ছায়ার গল্প ধরতে এসেছি। আচ্ছা, রাজবাড়ির মধ্যে কি কেউ এখনো থাকে?'

বেণু একবার আকাশের দিকে তাকাল, যেন অতীত আর বর্তমানের মাঝখানে কিছু খুঁজে ফেরে। তারপর হালকা হাসি ঝরে পড়ল তার ঠোঁট থেকে।

'থাকে। বিনায়ক রায় রাজ পরিবারের শেষ উত্তরাধিকার। খুবই নির্জন স্বভাব, রহস্যময় লোক। কেউ ঠিক চেনে না তাকে, কেউ বোঝেও না, শুধু গুজব শোনা যায় তার ঘর থেকে পিয়ানোর সুর ভেসে আসে প্রতিরাতে।'

ঈহান কিছু বলার আগেই দূরের এক জানলা থেকে মৃদু সুর ভেসে এল পিয়ানোর। যেন পুরনো রাজত্বের হাহাকার, প্রেম, পরাজয় আর অপেক্ষার অজস্র ছায়া একসঙ্গে মিশে গেছে কোনো অন্তিম রাগ। ঈহানের চোখে চমক। বেণুর ঠোঁটে আরও একটি গোপন হাসি। দু'জনে দাঁড়িয়ে রইল এক গোধূলির

আঁচে, শব্দহীন এক গল্পের দু'টি চরিত্র হয়ে।

পরদিন দুপুরে ঈহান যখন ক্যামেরা নিয়ে রাজবাড়ির পশ্চিম দিকের বারান্দা ঘুরছিল, হঠাৎই এক পুরনো পাথরের গায়ে নজর পড়ল। খসখসে স্পর্শ, আর তাতে খোদাই করা কিছু অচেনা চিহ্ন, গ্রীক বা আরবি ভাষার মতো, আবার যেন আদিম রুদ্রাক্ষের ছাপ। ঠিক তার নিচে, এক সরু গর্তের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছিল একটি সাদা খাম, ধুলোমলিন অথচ অদ্ভুতভাবে সংরক্ষিত। কৌতূহলে ভরে গিয়ে ঈহান খামটি টেনে বের করল।

চিঠির কাগজটি হলদে, কালো কালিতে লেখা, সময়ের গায়ে লেপ্টে থাকা এক আক্ষেপের কণ্ঠস্বর:

'তুমি প্রতিদিন এসে দাঁড়াও আমার জানালার নিচে। অথচ কোনোদিন ডাকো না। আমি জানি, তুমি সে নও, যাকে সবাই খোঁজে। তুমি অন্য কেউ। তবু, তুমি জানো আমার মৃত্যুর দিন।'

ঈহান থমকে দাঁড়াল। চোখ দু'টো স্থির হয়ে গেল কাগজের আঁচড়ে। কাকে লেখা হয়েছিল এই বার্তা? কেন মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী? উত্তর খুঁজতে দৌড়ে গেল বেণুর কাছে।

বেণু খামটি হাতে নিয়ে গভীর মনোযোগে পড়ে নিল। তারপর এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'এই চিঠি প্রেমের কথা বলছে না, ঈহান। বরং এক অব্যক্ত মৃত্যুবোধ, এক অসম প্রেমের ছায়া এঁকে রেখেছে এখানে।'

ঈহান জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বিশ্বাস করো, এগুলো নিছক কাকতালীয় নয়?'

বেণুর চোখে একরকম অচেনা আগুন, 'বিশ্বাস না করলেও এই চিঠি প্রমাণ করে এই রাজবাড়ি কেবলই ইট, পাথর আর ইতিহাসের স্মারক নয়। এর গভীরে আছে এক গোপন সত্য, হয়তো এমন কিছু যা আলোয় আসার ভয়েই এতদিন লুকিয়ে ছিল।'

সেই রাতেই ঘটে গেল অদ্ভুত এক কাণ্ড। ঈহান যখন তার ল্যাপটপে দিনের তোলা ছবিগুলো দেখতে চাইল, আবিষ্কার করল সব মুছে গেছে। যেন কেউ নিঃশব্দে ঢুকে এসে মুছে দিয়েছে সমস্ত প্রমাণ।

'অদ্ভুত ব্যাপার!' ঈহান বিস্ময়ে চোখ কুঁচকে বলল, 'আমি তো অফলাইনে ছিলাম। কোনো ডেটা শেয়ার করিনি, কোনো অ্যাপে লগ-ইন করিনি। তবু সব ছবিই উধাও!'

বেণু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, 'এই ক্যামেরাটা কি আগে অন্য কারও হাতে গেছিলো?'

'হ্যাঁ', একটু থেমে ঈহান বলল, 'সেই দিন ফটো এক্সিবিশনে দিয়েছিলাম। একটা লোক অনেকক্ষণ ধরে আমার ক্যামেরা হাতে নিয়ে ঘুরে দেখছিল। লম্বা চুল, ধবধবে পোশাক... মনে হচ্ছিল যেন সময়ের বাইরের কেউ।'

বেণুর মুখ থমথমে হয়ে উঠল, 'সে কি বিনায়ক রায় হতে পারে?'

'জানি না', ঈহান একটু ঘাবড়ে গেল। 'তবে একটা কথা সত্যি ওর ঘর থেকে মাঝেমধ্যে পিয়ানোর সুর ভেসে আসে। কিন্তু কখনো কাউকে দেখা যায় না। আর আমি ওকে কখনো কারো সঙ্গে কথা বলতে দেখিনি। ও যেন একটা ছায়া, শুধু বাজে আর হারিয়ে যায়।'

বেণু নিচু গলায় বলল, 'পিয়ানোর সুর, নিখোঁজ ছবি আর সেই অদ্ভুত চিঠি— সব যেন একে অন্যকে খুঁজে ফেরে, ঈহান। কিছু একটা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে অদৃশ্য জানালার আড়াল থেকে।'

তবে পরদিন, অচেনা এক কৌতূহলে টান পড়ে দু'জনেরই। রাজবাড়ির পেছনের ধুলোমলিন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে তারা পৌঁছায় এক পরিত্যক্ত চিলে কোঠায়, যেখানে বহু বছর কেউ পা রাখেনি। সেখানেই ধুলো জমা এক কাঠের বাক্সের ভিতর থেকে তারা উদ্ধার করে একটি জীর্ণ, চামড়ার বাঁধাই করা জার্নাল, যেটি লেখা হিমাঙ্গিনী দেবীর হাতে, বিনায়কের ঠাকুরমা। সেই জার্নালের প্রতিটি পাতায় যেন ইতিহাসের স্নায়বিক গিঁট, যেখানে প্রেম, ছায়া ও প্রতিহিংসার জাল একে অপরকে গ্রাস করে নিয়েছে।

পাতাগুলোতে অদ্ভুত এক আলো-ছায়ার খেলা, যেন প্রতিটি শব্দেই ঢেউ খেলছে এক গোপন বেদনার ছায়া। এক পাতায় লেখা—

'তিনি ছিলেন আলোকচিত্রী। আলো তার ভাষা, আর আমি ছিলাম তার ছায়া। আমার জীবন ছিল আয়নার মতো পরিষ্কার, আলোয় ভরা; কিন্তু ওর ছায়ায় আমি হারিয়ে যেতে পারতাম চোখ বন্ধ করলেই। সেই হারানোই আমার পাপ, আর সেই পাপই আমার মুক্তি। তাঁকে আমি খুন করেছিলাম ভালোবাসা আর প্রতিহিংসার দোলাচলে দাঁড়িয়ে। তারপর তাঁর মৃতদেহ লুকিয়ে রেখেছিলাম এই রাজবাড়িরই এক গোপন কক্ষে। কেউ জানে না সেই ঘরের কথা, যেমন কেউ জানে না আমার অন্তর্ধান। তারা ভাবে আমি আত্মহত্যা করেছিলাম, কিন্তু আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম নিজেকে লুকিয়ে ফেলে, সেই ছায়ার পৃথিবীতে, যেখানে আলো পৌঁছায় না।'

এই স্বীকারোক্তি যেন হঠাৎ করে খুলে দিল এক শতাব্দীর পুরনো গোপন দরজা, যেখানে ইতিহাস কেবল তথ্য নয়, অনুভূতির ধ্বংসাবশেষ। বিনায়ক ও ঈশা অনুভব করল, তাদের সামনে খুলে গেছে এক অজানা আবরণ, যার মধ্যে চাপা পড়ে আছে এক নারীর অমীমাংসিত যন্ত্রণা আর এক আলোকচিত্রীর নিঃশব্দ মৃত্যু।

'মানে সেই মানুষটা... এই বাড়িটার ঠিক নিচে গুম হয়েছিল?' ঈহান কাঁপা কণ্ঠে বলল, চোখে এক অজানা শীতল সন্ত্রাসের রেখা।

বেণু কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চুপ, তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'তুমি কি কখনও ভাবো তুমি হয়তো তার পুনর্জন্ম?'

ঈহান যেন ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল। 'কি বলছো তুমি? পাগল হয়ে গেছো নাকি?'

বেণুর গলায় ছিল অদ্ভুত প্রশান্তি, যেন দীর্ঘদিনের বোঝা আজ খুলে দিচ্ছে, 'তুমি জানালার নিচে ঠিক একই জায়গায় দাঁড়াও, যেমনটা সে দাঁড়াত। প্রতিদিন। কোনো ব্যাখ্যা ছাড়া। তুমি বাড়ির ছায়াগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকো, দীর্ঘ সময় ধরে, ঠিক যেমন কেউ পরিচিত মুখ খুঁজে বেড়ায়। অথচ তুমি ছবি তুলো না, আলো কিংবা কাঠামোর প্রতি উৎসাহ দেখাও না, শুধু চেয়ে থাকো। যেন এই দেওয়ালের ভাঁজে, এই পাথরের ধুলোয় লুকিয়ে আছে তোমার হারানো অতীত।'

ঈহান নীরব, ঠোঁট কাঁপে। তারপর নিঃশব্দে মাথা নাড়ে। 'যদি... যদি আমি সত্যিই তারই অংশ হয়ে ফিরি... তাহলে কি তুমি?'

বেণুর চোখে যেন ঝলসে ওঠে বিস্ময় আর স্বীকৃতির এক যুগল ঝলক।

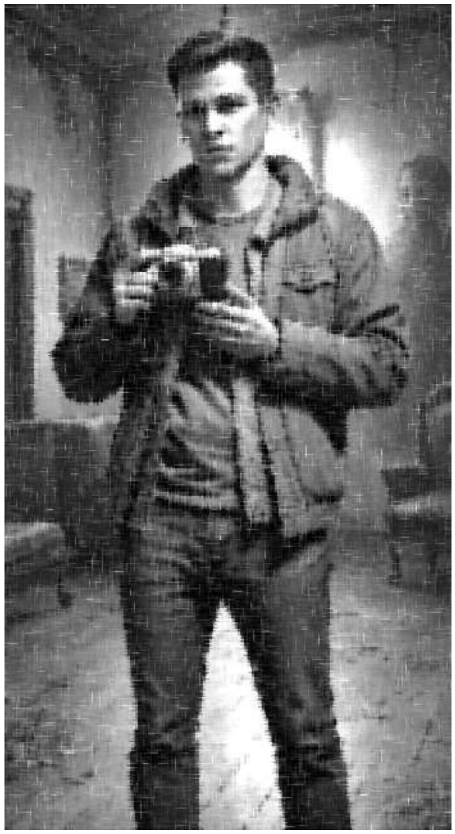

'আমি জানি না, ঈহান। কিন্তু এক অদ্ভুত অচেনা টান টের পাই এই বাড়ির প্রতি। মনে হয়, কোনোদিন এখানে দৌঁড়েছি... ঘামের গন্ধ, ধুলোর ধোঁয়া... সিঁড়ির বাঁক ঘুরে যেন লুকোতে গেছি কারও কাছ থেকে। কখনও স্বপ্নে দেখি, ধুপধাপ পায়ের শব্দ... আর আমি... আমি ছুটছি।'

দু'জনেই তখন নিঃশব্দ, ভেতরে শুধু ধুকধুক করছে সেই অনুজ্জ্বল, অথচ তীব্র অচেনা স্মৃতি, যাকে হয়তো তারা জন্মেই এনেছে, কিন্তু কোনোদিন জানত না।

তাদের কথোপকথনগুলো যেন দিনে দিনে আরও গভীর হয়ে উঠছিল অতীতের দহন, বর্তমানের টানাপোড়েন আর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ঘিরে। কিন্তু একদিন, সবকিছু থমকে গেল। বেণু হঠাৎ উধাও। কোন ফোনকল নয়, শুধু একটি নিস্তব্ধ টেক্সট এসে পৌঁছালো ঈহানের মোবাইলে—

'আমার মৃত্যুর দিন কেউ জানত।'

বুকের ভেতর হঠাৎ জমে উঠল একটা অজানা শূন্যতা। ঈহান ছুটে গেল থানায়, কণ্ঠে দমবন্ধ করা উদ্বেগ। সেখানেই তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় অমর্ত্য চৌধুরীর। তিনি সাইবার সেলের অফিসার। চোখে পাতলা ফ্রেমের চশমা, কিন্তু তার অন্তরালের দৃষ্টিতে যেন শীতল আগুন।

অমর্ত্যর কথাবার্তা ছিল সংক্ষিপ্ত, কিন্তু প্রশ্নের ধার ছিল নিখুঁত অস্ত্রের মতো।

'বেণু আপনাকে শেষবার কী বলেছিল?'

'সত্যিটা জানার জন্য অপেক্ষা করো... এটুকুই বলেছিল', ফিসফিস করেছিল ঈহান।

অমর্ত্য তখনই নির্দেশ দেয়, বেণুর মোবাইল লোকেশন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ক্লাউড ব্যাকআপ সব খতিয়ে দেখতে হবে। তার বিশ্লেষণী চোখ একবার স্ক্রিনে তাকালেই যেন কোডের আড়ালে সত্তার কাঁপুনি টের পায়।

ঈহানের বুকের ভিতরে তখন কেবলই এক ধরনের নীরব বিস্ফোরণ। বেণু কি নিছক নিখোঁজ, না কি সে নিজেই নিজের অন্তর্ধানের ছক কষেছিল? আর সেই অদ্ভুত মেসেজ, তাতে কি কারও প্রতি ইঙ্গিত ছিল?

অমর্ত্যর ঠান্ডা গলায় উচ্চারিত হল, 'এই খেলাটা খুব সূক্ষ্মভাবে তৈরি করা হয়েছে। কেউ চাইছে তোমাকে কিছু দেখাতে, কিন্তু তার আগে কিছু লুকোতে।'

তদন্তের প্রথম ধাপে খুলতে শুরু করল এক রহস্যের গিঁট, যার শেষ প্রান্তে অপেক্ষা করছিলো এক অজানা আঁধার।

'তোমার ক্যামেরা হ্যাক হয়েছিল', অমর্ত্য গভীর গলায় বলল, যেন প্রতিটি শব্দে ধ্বনিত হচ্ছিল কোনো অজানা ফাঁদের গুঞ্জন। 'তবে এটা সাধারণ হ্যাক নয়। সফটওয়্যারের মাধ্যমে নয়, সরাসরি হার্ডওয়্যারে কোড বসানো হয়েছিল। ক্যামেরার প্রাণেই ঢুকেছিল সে অদৃশ্য, নিঃশব্দ, নিখুঁত।'

ঈহান বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে করল এটা?'

অমর্ত্য চশমার কাচ ঠিক করে নিল, চোখে তার সেই চির চেনা নির্লিপ্ত বুদ্ধির রেখা। 'তুমি বলেছিলে, একবার ফটো এক্সিবিশনে দিয়েছিলে ক্যামেরাটা। আমি সেই তালিকা চেক করেছি। বিনায়কের নামও সেখানে ছিল অতিথি হিসেবে।'

মুহূর্তে যেন ঘন হয়ে উঠল বাতাস, ঈহানের মুখে থেমে গেল বাক্য। তার মনজুড়ে একটাই প্রশ্ন বিনায়ক কি শুধু এক রহস্যময় উত্তরাধিকারী, নাকি সেই ছায়া, যে সব জানে, সব দেখেছে, আর এখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে তার নিজের অতীত, তার ছবির ভেতরকার না-বলা ইতিহাস পর্যন্ত?

ঝড়ো হাওয়ার মতো ছুটে এল ঈহান পটেশ্বরী রাজবাড়ির প্রাচীন ফটকে। অন্ধকার তখন শহরকে ঢেকে ফেলেছে, অথচ রাজবাড়ির এক কোণে জ্বলছে এক নিস্তব্ধ আতঙ্কের আলো। চিলে কোঠার ধুলোমাখা সিঁড়ি পেরিয়ে সে হঠাৎ লক্ষ্য করল একটি গোপন দরজা খোলা। দরজার গা ঘেঁষে ছায়া যেন ফিসফিস করছে।

সে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল সেই গোপন টানেলে। স্যাঁতস্যাঁতে বাতাস, পাথরের দেওয়ালে হিম ছোঁয়া, আর তীব্র নিঃশ্বাসের শব্দ তার কান চিরে যাচ্ছে। খানিক এগোতেই দৃশ্যটা চোখে পড়ল মোমের আলোয় বেণু পড়ে আছে মাটিতে, অচেতন, নিঃসাড়। আর তার সামনে দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত স্থিরতায় বিনায়ক, হাতে ধরা চকচকে পিস্তল। তার চোখ যেন দগ্ধ অতীতের প্রতিচ্ছবি, যেখানে ভালোবাসা রূপ নিয়েছে প্রতিশোধে।

'তুমি কে?' বিনায়কের কণ্ঠে ছিল নিঃশব্দ অথচ শীতল এক তীক্ষ্ণতা।

'ঈহান', ঈহান শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল, 'বেণুকে ছেড়ে দাও। সে তোমার শত্রু নয়।'

বিনায়কের চোখ লালচে হয়ে উঠল। 'তুমি ফিরে এলে কেন? তোমার জন্যই আমার ঠাকুরমা শিশুকালে আত্মঘাতী হলেন। তাঁর সেই আলোকচিত্রী প্রেমিক তোমার পূর্বসত্তা।'

ঈহান ধীরে এগিয়ে এল, তার গলায় এক অদ্ভুত কোমল তীব্রতা। 'ভালোবাসা কাউকে মারে না, বিনায়ক। ঘৃণাই খুন করে। তুমি যদি সত্যিই বুঝতে, তবে দেখতে তোমার ঠাকুরমা পালাতে চেয়েছিলেন এই ঘৃণার দুনিয়া থেকে, ভালোবাসার জন্য, ক্ষমার জন্য।'

টানেলের বাতাস তখন বোঝা হয়ে উঠছে আত্মার ইতিহাস, স্মৃতির

ছায়া আর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা দু'টি জন্মের প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছিল নিঃশব্দে।

পুলিশ পৌঁছে গেল ঠিক সময়েই। অমর্ত্য চৌধুরীর নেতৃত্বে টানেল চত্বর মুহূর্তেই ঘিরে ফেলা হলো। তার শীতল, অনমনীয় চোখে ধরা পড়ল বিনায়কের মুখ, যেখানে ভয় নয়, বরং এক গোপন ক্লান্তি ঘুমিয়ে ছিল, যেন সেই মুহূর্তটির জন্যই সে প্রস্তুত ছিল বহুদিন ধরে। পিস্তলটা নিঃশব্দে পড়ে গেল পাথরের মেঝেতে, আর অমর্ত্যের নির্দেশে বিনায়ককে হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হল, অন্ধকার টানেলের শেষ প্রান্তের মতোই এক অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে।

বেণুর দেহ তখনো নিস্তেজ, কিন্তু নিঃশ্বাস ছিল, ধীরে ধীরে স্থিত হচ্ছিল। ঈহান তার পাশে বসে থাকল নিঃশব্দে, কাঁধে হাত রাখল, যেন কোনো শব্দের প্রয়োজন নেই। জীবন ফিরে আসার শব্দ অনেক সময় নিঃশব্দেই হয়।

টানেলের এক অদূর কোণে পুলিশ যখন অনুসন্ধান চালাচ্ছিল, তখন হঠাৎই পাওয়া গেল একটি ক্ষয়িষ্ণু কঙ্কাল, অস্থিচর্মবিহীন, কিন্তু বুকের পাশে রাখা এক সস্তা পুরনো ক্যামেরা যেন শতাব্দীর অপেক্ষায় ছিল, তার গল্প শোনানোর জন্য। সেই ক্যামেরার ধুলো মুছে যখন ঈহান তার লেন্সের দিকে তাকাল, মনে হলো যেন সে নিজের চোখে তাকাচ্ছে, ভেতরে চিরন্তন এক প্রশ্ন, যা প্রজন্ম পেরিয়েও রয়ে গেছে অমীমাংসিত।

হিমাঙ্গিনী দেবীর চিঠি ও জার্নালের পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা উল্টে স্পষ্ট হয়ে উঠল সেই অস্ফুট প্রেম গাঁথা, যে আলোকচিত্রী ছবি তুলতে তুলতে ভালোবেসে ফেলেছিল এক রাজকন্যাকে, আর সেই ভালোবাসাই তাকে নিয়ে গিয়েছিল মৃত্যুর নিঃসীম ছায়ায়। ভালোবাসার দায় তার প্রাণ নিয়েছিল, আর প্রজন্মের পর প্রজন্ম সেই ইতিহাস বয়ে এনেছে পুনর্জন্মের গল্প হয়ে।

বেরিয়ে আসার পথে গোধূলির আলো পড়েছিল রাজবাড়ির ধুলোমাখা করিডোরে, আর হালকা হাওয়া উড়িয়ে এনেছিল টানেলের ভেতরের সেই অচেনা গন্ধস্মৃতি, অনুশোচনা আর মুক্তির।

বেণু ধীরে ধীরে হাঁটছিল, পাশে ঈহান। সে হঠাৎ থেমে বলল, 'তুমি কি জানো, ঈহান, ভালোবাসা কেবল ইতিহাস নয়। এটা পুনর্জন্মও।'

ঈহান একটু হেসে তাকাল তার দিকে। 'তবে আজকের ছায়াগুলোর ছবি তুলবো?'

বেণু তাকিয়ে রইল সামনের দিকে। চোখে ভেসে উঠল এক অদ্ভুত দীপ্তি, যেন সেই রাজকন্যার ছায়া নিজের ভিতরেই জেগে উঠেছে। সে ধীরে বলল, 'ছায়ারা কেবল দেখা যায়, ধরা যায় না। ধরা গেলেই তারা আর ছায়া থাকে না, ঈহান। তারা হয়ে যায় অতীত।'

ঈহান ক্যামেরার লেন্স নামিয়ে আনল। বাতাসে যেন এক ধ্বনি ভেসে উঠল, আলো আর ছায়ার মাঝের অদৃশ্য সীমানা, যেখানে ভালোবাসা রয়ে যায় চিরকাল অপূর্ণ, চিরকাল অমর।

কবি নজরুল ও স্ত্রী প্রমিলার সাথে দুই ছেলে

ধানমণ্ডি কবি ভবনে বাঁ দিক থেকে - উমা কাজী, মিষ্টি কাজী, কবি নজরুল ও বাবুল কাজী

আশালতা-নজরুলের পরিণয়

চিত্রা রায়

আজ থেকে একশ বছর আগের কথা। সে দিনটি ছিল ১৯২৪ সালের ২৫ এপ্রিল,১২ বৈশাখ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ। রমজান মাসের ২০ রমজান, রোজ শুক্রবার। কলকাতার বেনিয়াপুকুরের ৬ নম্বর হাজি লেনের ভাড়া করা এক বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান। কোন জাঁকজমক নেই। নহবতের সানাই বাজেনি, বাজেনি বিয়ের বাজনা।

বর মুসলমান এবং কনে হিন্দু। হ্যাঁ, কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে আশালতা সেনগুপ্তের বিয়ের কথা বলছি। এই ঐতিহাসিক ঘর বাঁধায় ছিল সমস্ত ধরনের ধর্মীয় বিরূপতা, অপবাদ, নিন্দা এবং লোকগঞ্জনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের এক অভিমুখ।

গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়েছিল বিয়ের পুরো প্রক্রিয়ায়। উপস্থিত ছিলেন মাত্র আটজন। বর-কনে ছাড়া ছিলেন কাজীমৌলবী মইন উদ্দীন হোসেন, উকিল আবদুস সালাম, সাক্ষী সাংবাদিক মোঃ ওয়াজেদ আলী এবং কবি খান মুহাম্মদ মইউদ্দিন। কনে পক্ষে গিরিবালাদেবী আর বরপক্ষে মিসেস এম রহমান। মিসেস এম. রহমান ছাড়া নজরুলের অভিভাবক বলতে কেউ ছিলেন না। বিয়ের সমস্ত খরচ তিনিই দিয়েছিলেন। সেই সময়ের পটভূমিকায় তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সাহসী এবং প্রশংসনীয়।

অপরদিকে, গিরিবালার কোনও আত্মীয় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। আগে থেকে বিয়ের তারিখ ঘোষণা না করায় নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তখন নজরুলের বয়স ছিল ২৪ বছর আর আশালতার ১৬ বছর। আশালতার বয়স ১৮ বছর না হওয়ায় বিবাহ সংক্রান্ত আইন অনুসারে বিয়েতে বিপত্তি ঘটে। এদিকে, বর এবং কনের ধর্ম আলাদা। মুসলিম ধর্মমতে কনের ধর্মান্তর না হলে বিয়ে হয় না। আশালতাকে ধর্মান্তরিত করতে নজরুল রাজি ছিলেন না। তাই বাধ্য হয়েই ১৮৭২ সালের ৩ নম্বর সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী কনেকে ‘আহলে কিতাব’ পরিচয়ে ১০০০ টাকা দেনমোহর ধার্য করে বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই নিয়মে বর-কনে নিজের ধর্ম বজায় রাখতে পারে।

কে এই আশালতা সেনগুপ্ত? দুটি ভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে এই বিয়ের প্রেক্ষিত বা কী? তদানীন্তন রাজন্য ত্রিপুরা রাজ্যের নায়েব বসন্তকুমার সেনগুপ্ত এবং তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী গিরিবালা দেবীর একমাত্র সন্তান আশালতা ওরফে দোলন। ডাক নাম দুলি। বিয়ের পরে নজরুল আশালতার নাম রেখেছিলেন প্রমীলা। আশালতার জন্মের কিছুদিন পর তাঁর বাবা বসন্তকুমার সেনগুপ্ত মারা যান। স্বামীর অকাল মৃত্যুতে গিরিবালা দেবী অসহায় হয়ে পড়েন। নিরুপায় হয়ে তিনি মেয়েকে নিয়ে দেওর ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের কুমিল্লার কান্দিরপাড়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। কুমিল্লা তখন ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের চাকলা রোশনাবাদের অন্তর্গত। পড়াশোনার জন্য আশালতাকে ভর্তি করানো হয় কুমিল্লা শহরের বিখ্যাত ফয়জুন্নেসা গার্লস হাইস্কুলে।

কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের ফলে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। পারিবারিকভাবেই আশালতারা ছিলেন সংস্কৃতিমনা। সঙ্গীতে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল এবং গান খুব ভালো গাইতে পারতেন।

আশালতার সঙ্গে নজরুলের পরিচয়ের প্রেক্ষাপট এবং ঘটনাপ্রবাহ অনেকটা যেন 'বিধির বিধান'। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে কলকাতার এক বিশিষ্ট পুস্তক প্রকাশক আলী আকবর খান নজরুলকে বীরেন্দ্র কুমার সেনগুপ্তের কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আলী আকবর বীরেন্দ্র কুমারের সহপাঠী হওয়ায় ঐ বাড়ীতে সবসময় আসা-যাওয়া ছিল। বীরেন্দ্র কুমারের স্নেহশীলা মা বিরজাসুন্দরী দেবীকে আলী আকবরও মা বলে ডাকতেন। বীরেন্দ্র কুমারের বাড়ী থেকেই নজরুলকে আলী আকবর খান তাঁদের গ্রামের বাড়ী কুমিল্লার দৌলতপুরে নিয়ে যান। সেখানেই সৈয়দার সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয় এবং প্রথম প্রেমের উন্মেষ ঘটে। নার্গিস নামটি নজরুলের দেওয়া। আলী আকবরের প্রশ্রয়ে সম্পর্ক আরো গভীর হয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর পিতৃহীন ভাগ্নি সৈয়দা খাতুনের সঙ্গে নজরুলের বিয়ে দেওয়া। নজরুল বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন ১৯২১ সালের ১৮ই জুন তারিখে। কিন্তু ঘরজামাই হওয়ার প্রস্তাবে তিনি রাজী হননি। রাগে-অভিমানে বাসরঘর ছেড়ে চলে আসেন কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে বীরেন্দ্র কুমার সেনগুপ্তের বাড়িতে। সেখানে কিছুদিন ছিলেন। বিমর্ষ নজরুলকে বীরেন্দ্র কুমারের মা বিরজাসুন্দরী দেবী স্নেহ সহকারে প্রবোধ দিলেন,মায়ের মতো যত্ন-আত্তি করলেন। খুব অল্প সময়েই পরিবারে অন্যদের সঙ্গে পরিচিত হন। দোলনরা তখন ঐ বাড়ীতে থাকত। মাত্র তের বছরের কিশোরী। আট মাস পর অক্টোবর মাসের শেষে বা নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে নজরুল আবার কুমিল্লায় আসেন এবং এক মাস সেনগুপ্ত বাড়ীতে থাকেন। সেই সময়েই আশালতার সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় হয় এবং পূর্ব রাগ অর্থাৎ প্রেমের প্রথম প্রকাশ ঘটে। এরমধ্যেই প্রতিবাদী কবি হিসাবে তাঁর পরিচিতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা লেখার তথাকথিত অপরাধে তিনি কুমিল্লা থেকে ১৯২২ সালের ২৩ নভেম্বর গ্রেফতার হন এবং বিচারে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরদিনই তিনি কুমিল্লায় চলে আসেন।

কুমিল্লায় গিয়েই আশালতার সাথে সম্পর্ক নিয়ে সামাজিক বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন নজরুল। সুদর্শন তেজোদীপ্ত যুবা নজরুল প্রেমে ছিলেন বেপরোয়া। জয়-পরাজয়ের ঊর্ধ্বে হিন্দু-মুসলিম দুই ধর্মের বহু লোক তাঁদের মেলামেশার ঘোর বিরোধী ছিল। এলাকার ছেলেরা তাঁদের মেলামেশা আদৌ পছন্দ করত না। নজরুলকে যে কোন সময় অপমানিত হবার আশঙ্কা দেখা দিল। নেমে এলো নানা সামাজিক বাধাবিপত্তি। এমনকি বিরজাসুন্দরী দেবীসহ পরিবারের অন্যান্যরা এই সম্পর্কের ব্যাপারে অরাজি ছিলেন। বাধ্য হয়ে নজরুল চলে গেলেন কলকাতায়। ঘরে-বাইরে ক্রমাগত বিরোধিতার কারণে কিছুদিনের মধ্যে গিরিবালা দেবীও মেয়েকে নিয়ে কুমিল্লা ছেড়ে কলকাতায় যান। সমাজ ও আত্মীয়-স্বজনের মতামত অগ্রাহ্য করে নজরুলের কাছে মেয়েকে তুলে দিয়েছিলেন এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে নিরুদ্দেশ হওয়া পর্যন্ত টানা বাইশ বছর কবির ছন্নছাড়া পরিবারের পুরো দায়িত্ব কঠোর দৃঢ়তা, সাহস, উদারতায় নির্বিবাদে পালন করেছেন। আজ থেকে একশ বছর আগে উচ্চ বর্ণের একজন হিন্দু বিধবা হিসেবে তাঁর এই ভূমিকা নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক ছিল। নিষ্পেষিত এই মহীয়সী নারী চিরকাল নারীদের স্বাধীন চিন্তা ভাবনার প্রেরণার উৎস এবং প্রণম্য।

নজরুল ও প্রমীলার বিয়ের পরেও সামাজিক আক্রমণ,বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা, কুৎসা রটানো বন্ধ হয়নি। কিন্তু এতে তাঁরা দমে যাননি। প্রমীলা দেবীরও ছিল অন্তসলিলা এক সুন্দর কবি এবং শিল্পীসত্ত্বা। চিরকাল তিনি কবির কাব্য এবং সংগীত সাধনায় সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর লেখা 'শঙ্কিতা' ও 'করুণা' নামের দুটো কবিতা ছাপা হয়েছিল দ্বি-মাসিক 'সাম্যবাদী' পত্রিকায়।

নজরুল নতুন গানের সুরারোপ করে প্রমীলা দেবীকে শোনাতেন এবং সেই সুর ভুলে গেলে প্রমীলা দেবী গান গেয়ে তাঁকে মনে করিয়ে দিতেন। ব্যবহারিক জীবনযাপনে সমস্ত ধরনের ধর্মীয় এবং সামাজিক কূপমণ্ডূকতার ঊর্ধ্বে উঠে মানবতা এবং অসাম্প্রদায়িকতার জয়গান গেয়েছেন। বিশ্বমানবতা এবং অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা অন্বিত ছিল তাঁদের চিন্তা, মনন, সমস্ত ধরনের বঞ্চনা, অসাম্য, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী অবস্থান ইত্যাদিতে। কিন্তু তাঁদের সাংসারিক জীবনের রূঢ় বাস্তবতা ছিল অনেকটা 'রোদন ভরা বসন্তের' মতো। ছিল অপরিসীম আর্থিক অনটন, দুঃখ, কষ্ট, প্রিয় সন্তানের অকাল মৃত্যুর বিয়োগ ব্যথা, রোগশোক, বিষাদ, বিহ্বলতা এবং নানাবিধ ভাগ্যের পরিহাস। তা সত্ত্বেও তাঁদের প্রেম, ভালবাসা, শ্রদ্ধা এবং পারস্পরিক আস্থার সম্পর্ক অটুট ছিল আমৃত্যু, যার তুলনা আজও মেলা ভার।

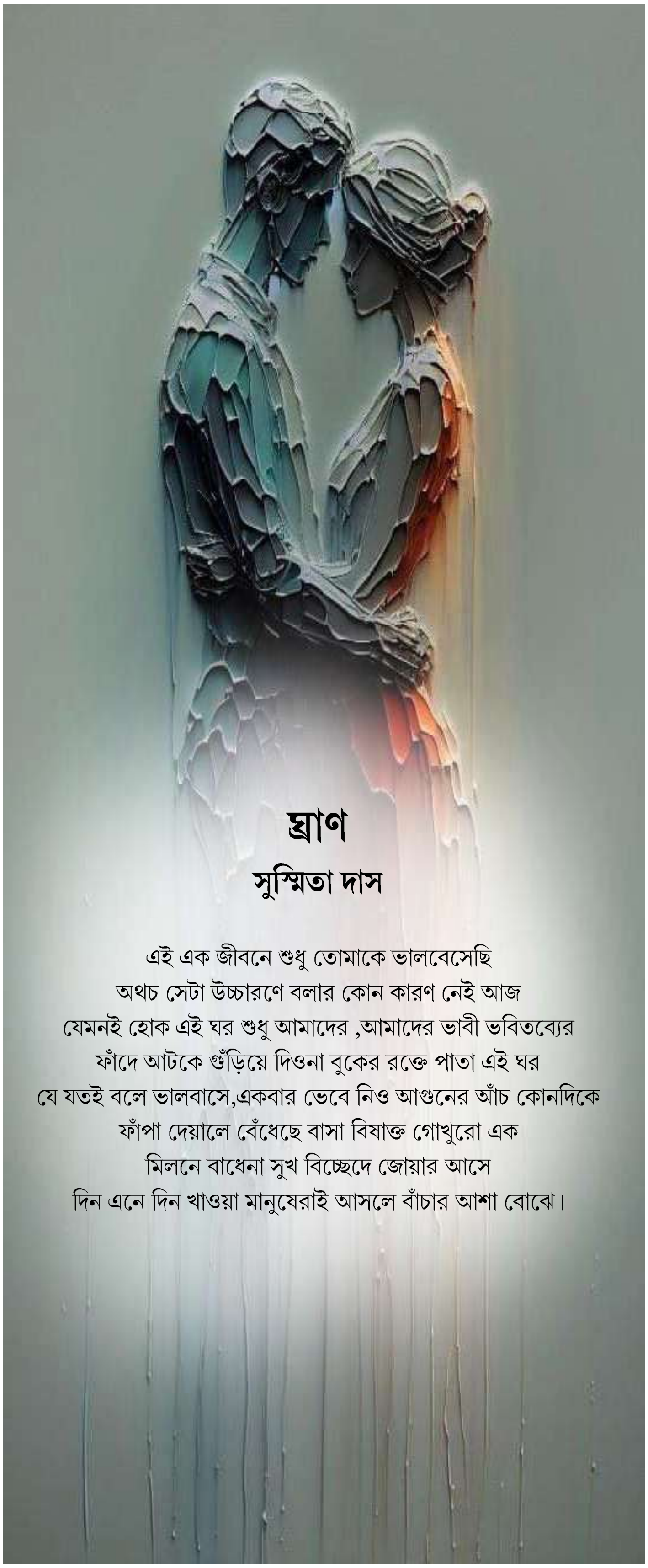

ঘ্রাণ

সুস্মিতা দাস

এই এক জীবনে শুধু তোমাকে ভালবেসেছি
অথচ সেটা উচ্চারণে বলার কোন কারণ নেই আজ
যেমনই হোক এই ঘর শুধু আমাদের ,আমাদের ভাবী ভবিতব্যের
ফাঁদে আটকে গুঁড়িয়ে দিওনা বুকের রক্তে পাতা এই ঘর
যে যতই বলে ভালবাসে,একবার ভেবে নিও আগুনের আঁচ কোনদিকে
ফাঁপা দেয়ালে বেঁধেছে বাসা বিষাক্ত গোখুরো এক
মিলনে বাধেনা সুখ বিচ্ছেদে জোয়ার আসে
দিন এনে দিন খাওয়া মানুষেরাই আসলে বাঁচার আশা বোঝে।

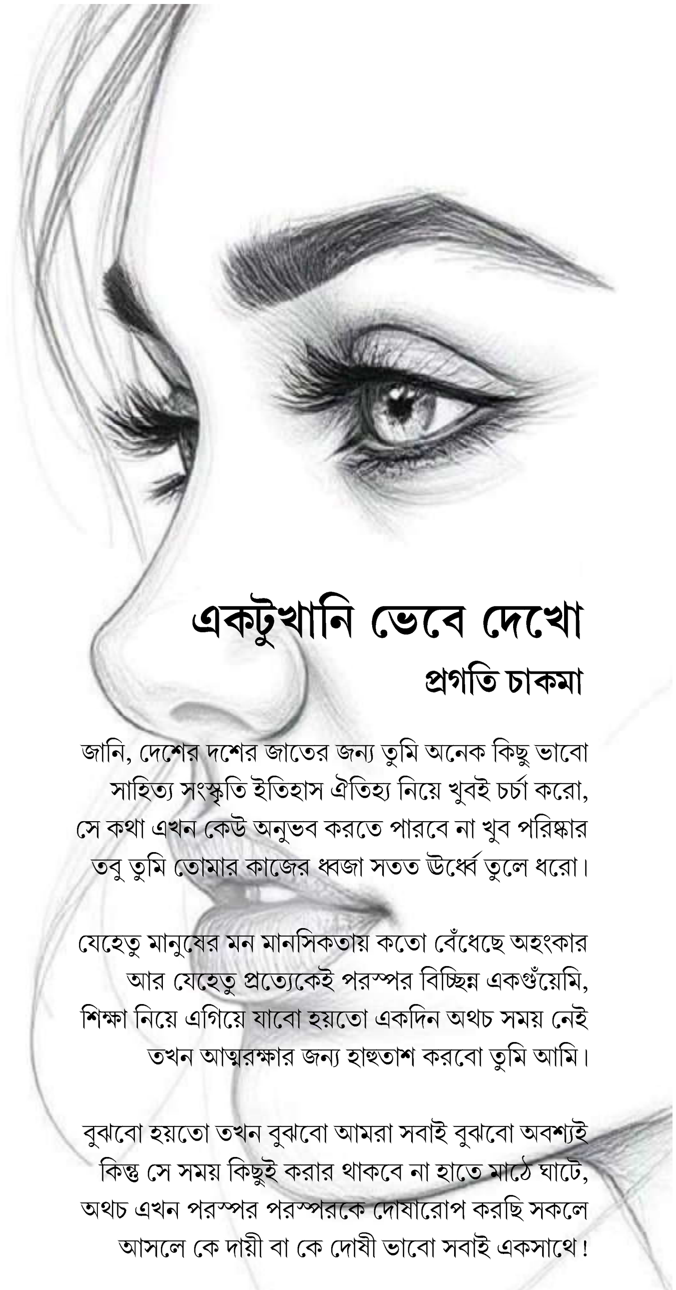

একটুখানি ভেবে দেখো

প্রগতি চাকমা

জানি, দেশের দশের জাতের জন্য তুমি অনেক কিছু ভাবো
সাহিত্য সংস্কৃতি ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে খুবই চর্চা করো,
সে কথা এখন কেউ অনুভব করতে পারবে না খুব পরিষ্কার
তবু তুমি তোমার কাজের ধ্বজা সতত উর্ধ্বে তুলে ধরো।

যেহেতু মানুষের মন মানসিকতায় কতো বেঁধেছে অহংকার
আর যেহেতু প্রত্যেকেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন একগুঁয়েমি,
শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাবো হয়তো একদিন অথচ সময় নেই
তখন আত্মরক্ষার জন্য হাহুতাশ করবো তুমি আমি।

বুঝবো হয়তো তখন বুঝবো আমরা সবাই বুঝবো অবশ্যই
কিন্তু সে সময় কিছুই করার থাকবে না হাতে মাঠে ঘাটে,
অথচ এখন পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করছি সকলে
আসলে কে দায়ী বা কে দোষী ভাবো সবাই একসাথে!

ঘরে বসে তুমি যদি অরণ্য রোদন করতে থাকো বিকল্প নেই
মানুষের ডাকে তুমি যদি সাড়া না দাও শুধু খুঁজো দোষ,
তোমার ডাকে কে সাড়া দেবে বলো পা দেবে বা কে তোমার
বলো তুমি বলো! এভাবে তবে কখন হবে আমাদের হুঁশ!

আজ আমি চিন্তা করছি কালকের জন্য আজকের জন্য নয়
আজকের জন্য যা হচ্ছে তা হল বিগত দিনের ফলাফল,
এখন যদি ভালো কিছু ভাবি আগামীর ফলাফল হবে ভালো
পরজনমে নয় এজনমেই মিলে যাবে বাস্তবতার সুদাসল।

ওরা জানে না ওরা কী বলছে

অনিল কুমার নাথ

ওরা আসলে ভুল করে মানুষ হয়ে ছিটকে পড়া
ক'টা বাঘ। উল্টো পিঠে হাঁটছে কচ্ছপকেও
পেছনে ফেলে। দিনকে রাত বলে ইদানীং ভুল করে
চোখ। বুঝি বা গাঢ় লজ্জায় দ্রুত মুখ লুকোয়
শুশুক। মৃত পাখির পালকের মত পুরনো
গানের কলি লুটোয় পথ ধারে। ক্রমশ বদলে
যায় জলজ ইতিহাস, স্বাধীনতার মানচিত্র। বাংলা
হারিয়ে ফেলে ভাষার ধ্রুপদী সৌরভ। যা নয়
তাই উগরোচ্ছে কতিপয় দিগভ্রান্ত মুখ। বিশেষ
একটা তখতে থেকে এমনি বখাটে উচ্চারণের
ছাড়পত্র পেয়ে যায় ওরা। স্পর্ধারও তো একটা
লক্ষ্মণরেখা থাকবে। ফুঁপিয়ে কাঁদছে আমার বিপন্ন
স্বদেশ যার জাতীয় সঙ্গীতের ভাষা বাংলা —
রবীন্দ্রনাথের জীবনানন্দের বাংলা — কৃত্তিবাস
কাশীরাম দাসের বাংলা — হেম-মধু-বঙ্কিম-নবীনের
বাংলা — তারাশংকর - মানিক-বিভূতির বাংলা।

ঈশ্বর, ক্ষমা করো ওদের,
ওরা জানে না ওরা কী বলছে।

সোনার আংটি

অগ্রতা দেব

টং দোকানে ব্যবসা করে
খৈনি, পান আর সিগারেটের
মাস ফুরোলে নোট গুনলে
হাজার টাকাও পায় না সে।

আঙুলে তার সোনার আংটি
শার্ট পরে সে লিনেনের,
নুন আনতে পান্তা ফুরায়
কুলায় তাহা ঋণ নিয়ে।

বাসা তার লাউয়ের মাচা
ভুগতে লাগে বর্ষাতে,
কোনোক্রমে খত দিয়ে সে
টাকা জমায় ঋণ করে।

চারিদিকে ইট বালি তার
দালান করলে অবশেষে,
মানুষের নাকি কইলজা পুড়ায়
কিন্তু ঘুমায় সে আজও মেঝেতে।

ঠিক তেমনি আজও আমি
দেখি দেশের কাণ্ড বসে,
আঙুলে তার সোনার আংটি
রাত কাটলে রাত আসে।

জল থৈ থৈ কবিতা
সংহিতা ভট্টাচার্য

আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা দেখলেই
জল থৈ থৈ কবিতারা এসে ভিড় জমায়
আমার মনের আঙিনায়।

আমি চুপচাপ বসে ওদের পায়ের শব্দ শুনি।
টুপটাপ ঝুপঝাপ! টুপটাপ ঝুপঝাপ!

শব্দ শুনতে শুনতেই আমার 'মনের ঘরে বৃষ্টি ঝরে।'

আমি নৌকা গড়ি নৌকা সাজাই, ভাসিয়ে দেই জলে।

আমি বৃষ্টি ভিজি, বৃষ্টিকে তুলে নেই করতলে সযতনে,
আবার কখনো মুঠো খুলে উড়িয়ে দেই বৃষ্টিকে।

কখনো কাঁদি কখনো হাসি
আমার দু'চোখ বেয়ে গঙ্গা নামে,
কলকল শব্দে বইতে থাকে আমার বুকের উঠোন জুড়ে।
আমি হারিয়ে যাই সেই কবিতার স্রোতে।

যুগান্তর
শেফালী ভৌমিক

পৃথিবীর বুক ছুঁয়ে চাঁদের আবছা আলো,
ঘুমন্ত পৃথিবী যাকে ছুঁতে পারে না।
হতাশ কান্নার আড়ালে চাঁদ ডুবে যায়
ভাঙা ঝুপড়ির আড়ালে—
সেই শীতল চাঁদের বুক থেকে
ছুটে যায় রক্ত স্ফুলিঙ্গ।
হতাশার শ্বাস - প্রশ্বাস ছুটে যায় সূর্য্যপানে।
তার থেকে প্রাণ নেবে একটা নূতন পৃথিবী
জেগে উঠবে শত শত জেহাদী মানুষ।
অঞ্জলি ভরে নেবে বিদ্রোহ বারুদ।
ভীরু কুয়াশার জাল কেটে দেবে
অশনি সংকেত,
সেই না দেখা নূতন গ্রহের জন্মলগ্নে।

প্রিয় কবি

ক্র ইরী মগ চৌধুরী

যখন পথে ঘাটে হাটে মাঠে
সর্বত্র মগের মুল্লুক,জলদস্যু,
এমন অপমানে জর্জরিত কলঙ্কিত।
তখন রবি ঠাকুর কোথা থেকে এসে
সাহিত্যের কোমল পরশে
যেন ডাক দিয়ে বলে—
এসো যুগান্তের কবি,
দাঁড়াও, ওই মানহীন মানবীর দ্বারে,
তুমিই বাঁচিয়েছিলে আমাদের মান,
নিয়ে গেলে বিশ্বের দরবারে।
বিসর্জন নাটকে তোমার অমোঘ বাণী,
'শুনেছিনো মগের মন্দিরে বলি প্রথা নেই।'
জীবের প্রেমিক মগ জনগণ তুমিই বুঝেছিলে,
খুন খারাপি কারোর ক্ষতি
তাদের চরিত্রে নেই।
যারা নির্বাক অখ্যাত অবজ্ঞাত,
যারা শোকে দুঃখে নতশির স্তব্ধ,
যারা কাছে থেকেও দূরে আবদ্ধ,
তাদের বাণীই হয়েছে ধ্বনিত।
তোমার সাহিত্যে তোমার কর্মে,
বিচিত্র রসে বিচিত্র আঙ্গিকে।
বিকৃত ইতিহাসে চারিদিকে
অপবাদের তমশা কালো,
রবি ঠাকুর, তোমার সাহিত্যের মশাল জ্বালিয়ে
দেখালে আমাদের নতুন দিশার আলো।
আমাদের কাছে অতি জরুরী তোমার আগমন,
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তুমি মহান তুমি অম্লান।
তোমার আগমনে ধন্য হলো
সকল ধর্মের জনগণ,
তাইতো তুমি সবার প্রিয়
সব হতে আপন।

আগমনী সুর

পৃথ্বীশ আচার্য

শরতের প্রভাত শোনায় আগমনী সুর,
এসেছে নতুন ভোর।
ভ্রমর শোনায় মধুর বাণী।
সেজেছে ঋতু রাণী।
শিউলি ছড়ায় সুবাস।
হিমের পরশ পেয়ে বাতাস,
পাতাকে বলে সাজিতে,
অচিরেই ঝরিবে,
শুদ্ধ হও ভিজে শিশিরের জলে।
মাধবী হেসে বলে পাতাকে,
শীত এখনো দূরে,
সাজাও নিজের আভা।
আগমনী গাও মায়াবী সুরে,
আসিবেন মাতা কৈলাশ থেকে।
শারদ রাজের কোলে।
আগমন হবে হাতির পিঠে,
ঢাকেশ্বরী সাজে।
আসে আশ্বিন মাসে,
আনন্দ হরষে।
সাজাও নিজেকে শারদীয়া পরশে।

মায়ের আগমন

মনচলি চক্রবর্তী

ঢাকের তালে বাজে সুর,
আশ্বিনে মেতে ওঠে গাঁ-শহর।
মা এসেছেন সিংহবাহিনী,
আনন্দে ভরে যায় এ ভুবনখানি।

কাঁসার থালায় প্রদীপ জ্বলে,
স্নিগ্ধ আলোর ছোঁয়া তোলে।
সিঁদুর খেলায় লাল রঙ ছড়ায়,
মায়ের বিদায়ে চোখে জল ঝরায়।

চার দিন শুধু সুখের উৎসব,
তারপর আবার অপেক্ষার অসব।

জীবন বৃত্তান্ত

পারমিতা দাশ

প্রকৃতির স্বাভাবিক কিছু নিয়ম মেনেই আমাদের এই পৃথিবীতে চলতে হয়। সময়ের সাথে সাথে আমি একদিন এই পৃথিবী থেকে চলে যাব। আমার সুখ-দুঃখও চলে যাবে আমার সাথে। আমার কাছে এই পৃথিবী বিশাল কিছু মনে হলেও পৃথিবীর কাছে আমি কিছুই না। আমি চলে যাবার পর পৃথিবীর কোথাও কোন পরিবর্তন হবে না। তাই জীবন এমনভাবে সাজাতে হবে যেনো বাস্তবতা বিবর্জিত না হয়।

সীমিত সময়ের উপহার এই জীবন। বিভিন্ন রঙে-বর্ণে সাজানো জীবনের নানা অধ্যায়ের মর্ম উপলব্ধি করেই জীবনের পথ চলা আমি শ্রেয়তর মনে করি। আমার আজকের আমি হওয়ার পেছনেও সবার রয়েছে কোনো না কোনো ভূমিকা। কথা বলতে না পারা আমি,হাঁটতে না জানা আমি প্রকৃতির কোলেপিঠে চড়েই বড়ো হয়ে ওঠা। তাই সবার কাছেই আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। বয়সের সাথে সাথে আমি খুব করে অনুভব করি কৃতজ্ঞতা বোধ একটা মানুষকে প্রশান্তিময় জীবন উপহার দেয়। আমরা যারা একা চলার শক্তি দেখাই,আমার জীবনে কাউকেই লাগবে না বলে থাকি, তারাও প্রতি মুহূর্তে গাছ থেকে অক্সিজেন নিয়ে থাকি।

আজকে আপনাদের সামনে কিছু কথা তুলে ধরতে চাই। আসলে আমাদের জীবন সবকিছুর সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। আবার অনেকক্ষেত্রেই মানিয়ে নিতে বাধ্য হয়। তবে পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে নিজেকে খাপ খাইয়ে মানিয়ে নেওয়াই উত্তম বলে আমি মনে করি। বাস্তবতার ভিত্তিতে প্রত্যেকটা জায়গায় নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারলেই জীবনের সার্থকতা। কারণ, নিজের ইচ্ছে মতো কিন্তু কখনোই কোন পরিবেশ চলে না, চলবেও না। মূলতঃ প্রকৃতিগতভাবে যে নিয়মগুলো বিদ্যমান আছে সেভাবেই কিন্তু আমরা চলে থাকি, তবেই জীবনে সবকিছু সুন্দর।

যাই হোক, জীবনের প্রয়োজনে সবকিছুই মেনে নিতে হয় এবং মানিয়ে নিতে হয়। আমার মতে মানব জীবন ভয়ঙ্কর সুন্দর। শুধু জীবনটা সঠিকভাবে উপভোগ করে নিতে হয়। পরিস্থিতি বুঝে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারলেই জীবন সার্থক,অন্যথায় আপনি জীবনে বৃথা চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। তাই সবকিছুর সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে ও মানিয়ে নিয়ে চলার মানসিকতা রাখতে হবে, তাহলেই সবকিছু সুন্দর।

এই পুরো পৃথিবীতে খুব অল্প কিছু মানুষকে আমরা নিজের করে পাই অথচ এই অল্প কিছু কাছের মানুষকেই অধিক সময় আমরা আগলে রাখতে পারি না বা সেই মানসিকতা রাখি না। সামান্য মনোমালিন্য,সামান্য অর্থ কিংবা একখণ্ড জমির জন্য পরিবেশ পরিস্থিতি এতোটাই জঞ্জালপূর্ণ তৈরি করে রাখি যা পরবর্তী প্রজন্মকেও সেই কূপে ডুবে থাকতে হয়। সম্পর্কগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে দামী সম্পদ,অর্থকড়ি নামক কোনো সস্তা জিনিসের কাছে সম্পর্কের বিসর্জন দেওয়া আমার কাছে এক চরম বোকামি।

তবে অন্যের পরামর্শে চলা আমার কোনো কালেই পছন্দ নয়। অন্যের আদর্শকে ধারণ করেই চলবো এমনটা ভাবিও না কখনো। আমি অন্যের মত হবো এই পণও করি না কখনো। আমার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখি নিজেকে। আমি বর্ণিল হবার জন্য হাজারবার শুদ্ধ হতে রাজি আছি। আমি নিজেকে মানুষ জেনেই পৃথিবীর সব মানুষকে মানুষ ভাবি। জীবনের রঙ্গমঞ্চ বড়োই স্পর্শকাতর। এখানে মোহ আছে,উৎকর্ষতা আছে, বৈভব আছে সাথে কখনো কখনো সম্মানও আছে। তবে আমার নিজের মতো হয় না বলে অন্যের সবকিছুতেই খুঁত ধরা তো আমাকে মানায় না। কারণ, আমি নিখুঁত নই। পৃথিবীর কোনো কিছুই শতভাগ নিখুঁত নয়।

জীবনের আনন্দ ও সুখ আমাদের আশেপাশেই ছড়িয়ে আছে,শুধু খুঁজে নেওয়ার দৃষ্টিটা থাকতে হবে এবং জানতে হবে। অল্পতেই সুখী হওয়ার আর সবাইকে নিয়ে সুখী হওয়ার অভ্যাসটাই পারে জীবনকে সুন্দর ও পরিপূর্ণ করে তুলতে।

আদতে কী পেলে মানুষ সত্যিকার অর্থে নিজেকে সুখী মনে করবে, সেটা কিন্তু মানুষ নিজেও জানে না। কারণ, বাস্তবতার সঙ্গে মিল রেখে

মানুষের চাহিদাও দিন দিন পরিবর্তন হয়। জীবনে চলার পথে আশা ও প্রত্যাশা— এই দুই শক্তিশালী বিষয়ের উপর আশ্রয় করেই মানুষ বাঁচে। আশা একটি ইতিবাচক মানসিক অবস্থা,যা মানুষকে উৎসাহিত করে, যেখানে প্রত্যাশা পূরণ না হলে হতাশা ও ক্ষোভ তৈরি হয়।

আশা করা ভালো। আমরা কোন কিছু নিয়ে আশা করলে সামনে এগোতে পারি এবং স্বপ্ন পূরণের রাস্তা তৈরি করতে পারি। তবে আশা জিনিসটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও, প্রত্যাশা জিনিসটা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তাই প্রত্যাশার বিষয়টি যত কম থাকবে ততই ভালো। বেশি প্রত্যাশা কখনো কখনো মানসিক অবসাদ ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মানুষ স্বভাবতই প্রত্যাশাপ্রেমী হয়। প্রতিটি মানুষ জীবনে অতি আপনজনের কাছে প্রত্যাশা করেই থাকে। আর এই প্রত্যাশা কথাটির সাথে ভালোবাসা কথাটি গভীরভাবে জড়িয়ে থাকে। কেননা প্রত্যাশার অর্থই হলো কোন কিছু পাওয়ার তীব্র আশা। আমিও কিন্তু এর ব্যতিক্রম নই।

প্রত্যাশা ততটুকু থাকা প্রয়োজন,যতটুকু না থাকলে বেঁচে থাকার আগ্রহটাই হারিয়ে যায়। সীমানাটা এমন হওয়া উচিত, যেখানে প্রাপ্তির বেশ ভালো একটা সম্ভাবনা থাকে। অন্যের প্রতি বা নিজের জীবনের প্রতি যার আশা,চাহিদা অথবা প্রত্যাশা যত বেশি, তার প্রত্যাশা ভঙ্গের বেদনাও তত বেশি হওয়াটাও স্বাভাবিক। জীবনের কোন কোন সময় মানুষকে বলতে শোনা যায় আমি তো ভেবেছিলাম আমার দরকারে আমার কাছের মানুষগুলো আমার পাশে দাঁড়াবে, খোঁজখবর নেবে এবং সাহায্য করবে। কিন্তু সবসময় মানুষের চিন্তা অনুযায়ী বা প্রত্যাশা মতো সব চাওয়া পূরণ হয় না এবং হওয়া সম্ভবও নয়।

এই আমি বা আপনি বিভিন্ন জনের কাছে যা প্রত্যাশা করছি, সেই আমি বা আপনি কি পারছি সবসময় অন্যের প্রত্যাশা পূরণ করতে? মানুষের ব্যস্ততা, জীবনযাপন সবই বদলে যাচ্ছে দিনদিন। মনে মনে চাইলেও অনেক কিছু করা সম্ভব হয় না। আমরা প্রত্যেকেই দৈনন্দিন জীবনের টানাপোড়েন ও ব্যস্ততায় ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়ছি। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের প্রত্যাশা থাকবেই প্রিয়জনদের কাছে। তবে প্রত্যাশাটা হওয়া উচিত পাশের মানুষটির মন, সামর্থ্য ও সময় বুঝে। নয়তো সুখের চেয়ে দুঃখই বেশি হবে।

মানুষ সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন করতে পারে যাকে,সেটা হলো নিজেকে। সবাই আমার কথা শুনবে বা বুঝবে এটা না ভেবে আমরাও তো সহানুভূতির সঙ্গে অন্য কারোর কথা শুনতে ও বুঝতে চেষ্টা করতে পারি। সাধ্যের মধ্যেই আছে সব সত্য। সাধ্যের বাইরে যে সাধ, তা কালে পূরণ হওয়ার নয়।

জীবন ভোরের শিউলির মতো এতো শুভ্র ও সতেজ নয়। জীবনে আনন্দ ও উল্লাসের পাশাপাশি জয়,পরাজয়, হতাশা, গ্লানি, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও সংশয় এই নেতিবাচক উপসর্গগুলো লেগেই থাকে। তাই বলে সর্বদা বিষাদে মগ্ন হয়ে থাকা যায় না। জীবনে সমস্যা যেমন থাকে, ঠিক সমানভাবে সমাধানও কোথাও না কোথাও লুকিয়ে থাকে।

'সন্তুষ্ট থাকার মধ্যেই সুখ' —এই উক্তিটির সঙ্গে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। তবে কে কিসে সুখী হবে তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। আমরা যে যার মতো সুখে থাকতে চাই। নিজের যতটুকু আছে তা নিয়ে যদি সন্তুষ্ট থাকি,তবেই কিন্তু আনন্দ খুঁজে পেতে পারি। সুখী হওয়া কিন্তু খুব কঠিন কিছু নয়। খুবই পরিচিত একটি কথা— সবাইকে আপনি হাজার চেষ্টা করেও খুশি করতে পারবেন না। আপনার কোনো না কোনো কর্মকান্ডে কেউ খুশি হলে,আবার কেউ বেজার হবেই। কারণ, আমরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বার। কাজেই সবাইকে খুশি করা একজনের পক্ষে সম্ভব নয়।

তবে বাস্তবতার জাঁতাকলে, যান্ত্রিক জীবন আমাদের আনন্দ-বিনোদনের সময়টুকুও দখল করে নিয়েছে। ফলে জীবনের কঠিন যুদ্ধে কেউ মানসিকভাবে হচ্ছে বিজয়ী, আবার কেউ হচ্ছে পরাজিত। সুখী হওয়ার মূল চাবিকাঠি কিন্তু রয়েছে প্রত্যেকের নিজের হাতেই। নিজের কাজটা আনন্দ দিয়ে করলেও সুখ খুঁজে পাওয়া যায়। অনেক সময়ই দেখা যায় মানুষ এমন কাজের সঙ্গে যুক্ত, যা করতে নিজেরাও পছন্দ করেন না। বাধ্য হয়ে অপছন্দের কাজ করতে গিয়ে তিনি হতাশায় ভুগতে থাকেন, যা তাঁকে অসুখী করে তোলে। একজনের সুখের বিষয় অন্যজনের কাছে সুখের বিষয় হবে এমনটা বলছি না কিন্তু।

সুখের সংজ্ঞায় কেউ এক সারিতে দাঁড়াতে পারেনি কারণ সুখের সঠিক সংজ্ঞায়ন করা অসম্ভব। তবে একটি বিষয় ধ্রুব যে, সুখকে অর্জন করতে হয়, অর্জন করতে জানতে হয়, সুখ নিজে থেকে ধরা দেয় না। জীবনের চারপাশের মানুষের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করলে মানসিক শান্তি লাভ করা সহজ হয়ে যায়। মানুষের সঙ্গে মেশার আগেই তাকে ঘিরে নেগেটিভ কিছু ভাবলে, নিজস্ব সৃষ্টিশীলতা দিয়ে তৈরি ক্ষুদ্র জগতে নিজেকে মানসিক দহনে হাঁসফাঁস করা ছাড়া তখন আর কিছু করার থাকে না। তাই আমি বিশ্বাস করি, জীবনে সুখ নামক সোনার হরিণ পেতে চাইলে আমাকে নিজের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব রাখতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে অন্যের নামে সমালোচনা করা বর্তমানে ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। তবে গঠনমূলক সমালোচনাকে সহজে গ্রহণ করা আমি শক্তিশালী গুণ মনে করি। আবার অনেকেই আছেন ভুল ধরিয়ে দিলে বা সমালোচনা করলে ভীষণভাবে প্রতিক্রিয়া দেখান। এটা কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের বিপক্ষে যায়। প্রকৃতপক্ষে সুখ সবখানেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে,তা ছুঁতে জানা চাই।

সময়ের সাথে সাথে নিজেকে পরিবর্তনশীল করে শিক্ষণীয় দৃষ্টিভঙ্গির মনোভাব পোষণ করার চেষ্টা করাই শ্রেয় মনে করি আমি। যারা আমার নিন্দা করে তাদের আমি কখনোই ছোট করে দেখার চেষ্টা করি না, বরঞ্চ সর্বদা ভালোবাসায় আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করি। অন্যের ভালো গুণগুলো দেখে নিজেকে সংশোধন করার মধ্যেও পরম তৃপ্তি খুঁজে পাই। আমার সাধ্যের মধ্যে তুষ্ট থেকে জীবনের দুঃখের স্মৃতিগুলো বাদ দিয়ে প্রিয় স্মৃতিগুলো স্মরণ করতে চাই। আমি বিশ্বাস করি,আমার সামান্য মনোযোগ, সামান্য সচেতনতাই চারপাশের পরিবেশকে করে তুলবে আরও বেশি সুন্দর, গড়ে ওঠবে সবার সাথে আমার মানসিক যোগাযোগ, এতে দূর হবে আমার একাকিত্ব, শত ব্যস্ততার মাঝেও অনুভব করবো বন্ধুত্বের ও ভালোবাসার পরশ। অবশেষে করজোড়ে প্রার্থনা রইলো ভগবানের চরণে, যেকোনো বিপদে মনোবল না হারিয়ে আমি যেন দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ম করার শক্তি পেয়ে থাকি। হাসিমুখে পুষ্পমাল্য হিসেবে যেনো সকল কর্মকে বরণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারি। ধর্মের কর্ম যেনো আমার কাছে 'আনন্দের কর্ম' প্রতিরূপে ধরা দেয়। কারণ, আনন্দের মাঝেই সুখ লুকায়িত। শুধুমাত্র একটু সুখকে খুঁজে নেওয়া।

সমাজ সেবক

চন্দন আচার্য

সেদিন মনটা চাইছিল দূরে কোথাও ঘুরে আসি। হঠাৎ সিমনাগামী গাড়ি সামনে পেয়ে তাতে উঠে পড়লাম। মনে করলাম বক্সাকুন্ড থেকে ঘুরে আসব। হঠাৎ কি মনে করে নেমে পড়লাম মোহনপুরের নবনির্মিত টাউনহলের সামনে। তাকিয়ে ছিলাম সেইদিকে। হঠাৎ শুনি কে বলছে, কর্তা কই যাইবেন? গলাটা কেমন চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। মুখ ফিরিয়ে দেখি, এ তো মেঘনাদবাবু। একসময় এদিকের একটি স্কুলের সহকর্মী ছিলাম। আমরা প্রায় সমবয়সী। তাই আমাদের মধ্যে ঠাট্টা ইয়ার্কি খোঁচাখুঁচি চলত। মাঝেমধ্যে দুঃখ করতেন, সমগ্র শিক্ষার শিক্ষক, বেতন কম, পেনশনও পাবেন না। জানতাম, চার-পাঁচ কাণি ক্ষেত আছে। তাই বলতাম, আপনি তো মহাজন। ধান কুফসল (শীতের ফসল) করে যা টাকা পাবেন, বেতনের দরকার আছে কি? উনি পাল্টা বলতেন, এদিকে তো আসেন যান স্কুলে, দেখেন তো মাঠ খালি পড়ে আছে, কেউ ধান চাষ করতে চায় না। এখন ধান চাষ করে খরচই উঠে না। শীতকালে হয়তো কুফসল করে কেউ কেউ। তারও হ্যাপা অনেক। হয়তো গরু-ছাগলে মুড়িয়ে খেয়ে নেয়, নয়তো ফসল রাতে চুরি হয়ে যায়। দু'একবার উনার বাড়িতেও গেছি। উনার স্ত্রী ভাল মানুষ। বোঝা যায়, দু'জনের মধ্যে সুন্দর মিলমিশ আছে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলে বি এড পড়ছে।

আমি বছর তিনেক পর চেষ্টা করে আগরতলার একটি স্কুলে বদলী হয়ে চলে এসেছি। মাঝেমধ্যে ফোনে কথা। উনি অবসরে যাবার পর খুব একটা যোগাযোগ রাখতেন না। সেই স্কুলের এক তরুণ সহকর্মী প্রদীপের মাধ্যমে স্কুলের সবার খোঁজ খবর রাখতে চেষ্টা করতাম। বলত, মেঘনাদবাবুকে আজকাল ফোন করলে পাওয়া যায় না।

আজ সেই খুঁজে বেরানো মেঘনাদবাবু, আমার কাছে হাজির, বিশ্বাস হচ্ছিল না। বললেন, কতদিন পরে দেখা, কোথাও যাচ্ছেন নাকি?

—না, একঘেয়ে লাগছিল কয়েকদিন ধরে। তাই ভাবলাম ঘুরে আসি। কোথায় যাব ঠিক করিনি। সামনে সিমনার গাড়ি পেয়ে উঠে পড়লাম। এখানে এসে হঠাৎ কি মনে পড়ে নেমেও গেলাম।

মেঘনাদবাবু একগাল হেসে বললেন, ভালই করেছেন। চলুন আমার বাড়িতে। গিন্নী প্রায়ই আপনার কথা বলেন। আজ গিয়ে চমকে দেবেন। উঠুন..উঠুন..।

—কিন্তু, আপনার টমটম? —পিছনে বসে জিজ্ঞেস করলাম।

—হ্যাঁ, সরকার তো আমাদের পেনশন দেয়নি। সংসার চলবে কি করে? কাজকাম ছাড়া বসে বসে টাকার চিন্তা করলে দেখছি শরীর মন দুই খারাপ হয়। তাই 'ডুব দে মা কালী' বলে কিছু টাকা যোগার করে এই পুরানো টমটম কিনে নিলাম। যখন সময় পাই টমটম নিয়ে বেড়িয়ে পড়ি। কিছু বাচ্চাদের স্কুলে আনা নেওয়ার মাসকাবারি আছে। আর কিছু আমার মতো বৃদ্ধবৃদ্ধা কোথাও যেতে হলে আমাকে ফোন করে। ওদের বাড়িতে নামিয়ে দিলে আমার ছুটি হয় না। খানিকক্ষণ গল্পগাছা করে ভালমন্দ খাইয়ে তবে ছুটি। এই নিয়ে ভাল আছি ভাই।

আমি বললাম, সত্যি ভাল আছেন। মানুষের সঙ্গ পাচ্ছেন, কিছু রোজগারও হচ্ছে। আমি হয়তো পেনশন পাই, মানুষের সঙ্গ সেইভাবে পাই না। অবশ্য নতুন জায়গায় থাকি। এছাড়া ছোটবেলা, স্কুলজীবন এবং বেশিরভাগ চাকুরি মফঃস্বল শহরে থেকে করেছি। পড়ন্ত বেলায় নতুন জায়গায় এসে কি আর

সেইভাবে বন্ধুত্ব হয়? মন খুলে কথা বলা বা আড্ডা দেওয়া সম্ভব না।

মেঘনাদবাবু বললেন, তবে চলে আসেন এখানে।

ম্লান হেসে বললাম, সেকি আর সম্ভব!

বাড়ির সামনে টমটম থামিয়ে হাঁক পেড়ে বললেন, কই গো গিন্নি, দেখো কাকে ধরে এনেছি। তাড়াতাড়ি বের হও।

গেইট খুলে টমটম ঢুকাতেই দেখি উনার গিন্নি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, কতদিন পরে আপনাকে দেখতে পেলাম। আমাদের কি ভুলে গেলেন? আসুন ঘরে।

আমি ঘরে যেতে যেতে দেখলাম, উঠোনের একপাশে প্রচুর চারা গাছ কালো পলিথিনের প্যাকেটে রাখা আছে। বেশিরভাগই নিম। এছাড়া জাম, কাঁঠাল, বকুল, কৃষ্ণচূড়া এরকম চারা। ঘরে ঢুকতেই উনার স্ত্রী ফ্যান চালিয়ে, সোফাটা ঝেড়ে বললেন, বসুন আমি আসছি।

উনি চলে যেতেই, মেঘনাদবাবু জামাটা খুলে বসে বললেন, জামাটা খুলে আরাম করে বসুন। যা গরম। খেয়েদেয়ে একবারে বিকেলে যাবেন।

আমি বললাম, তা কি করে হয়, আমি তো বলে বের হইনি। আমার অপেক্ষায় খাবার না খেয়ে বসে থাকবে।

মেঘনাদবাবু হেসে বললেন, এখন সেসব কোন সমস্যা নাকি? ফোনে বলে দিন, আমার এখানে আছেন। খাওয়া-দাওয়া করে রোদ পড়লে বিকেলে ফিরবেন। অবশ্য আপনার বাড়ির মতো খাওয়া দাওয়া হয়তো করাতে পারব না। আমার সঙ্গে বসে দুটো ডালভাত খেয়ে যাবেন। আজ যেহেতু ঈশ্বর আপনাকে আমার বাড়িতে এনে হাজির করেছে, তাই দুটো ডালভাত খেয়ে যেতে হবে। আর হয়তো আমার জীবনে সেই সুযোগ নাও আসতে পারে।

কি আর করা! খেতে বসতেই হল। ক্ষেতের বেগুন, ঝিঙে, কচুশাক, এছাড়া ভোরবেলা সামনের ছোট নদীতে গিয়ে ধরে আনা ট্যাংরা, পুঁটি, কইসহ চুনো মাছের ঝোল, শেষ পাতে ঘরের গরুর দই দিয়ে গলা অবধি দু'জনের চাপাচাপিতে পেট ভরাতে হল। উনার স্ত্রী পান সাজিয়ে দিয়ে খেতে বসলেন।

মেঘনাদবাবু বললেন, ছেলের জন্য একটা মেয়ের খোঁজ দেন।

আমি বললাম, ছেলে কি করে এখন?

—সে তো বিএড পাশ করে টেট পরীক্ষা দিচ্ছে। কিন্তু চাকরি ছাড়ছে কই। আমি তো এই বয়সে এক ছেলের বাপ হয়ে গেছিলাম। দেখবেন কিন্তু।

ইতিমধ্যে উনার স্ত্রী রান্না ঘরের কাজ সেরে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, বাড়িতে অনেক গাছের চারা দেখলাম। বিক্রি করেন, নাকি জমিতে লাগাবেন?

উনার স্ত্রী বললেন--- বলবেন না, পাগলামিতে পেয়েছে। উনি বলেন— বনাঞ্চল ধ্বংস করে শহরায়ন হচ্ছে, তাই বায়ু দূষিত হচ্ছে, উষ্ণায়ন বাড়ছে, দেখা দিচ্ছে বন্যা-খরা, পশুপাখি,গাছপালা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই সবাই মিলে গাছ লাগাতে হবে। বন দপ্তর কিংবা আসতে যেতে কোথাও গাছের চারা দেখলে তুলে আনেন। তারপর টমটম নিয়ে বের হবার সময় কিছু চারা আর ছোট্ট শাবল সঙ্গে নেন। পথের ধারে খালি জায়গা দেখলে পুঁতে দেন। কোন সময় উনার বয়স্ক বন্ধু কিংবা ছাত্ররাও হাত লাগায়।

আমি বললাম, ভাল কাজ। পরবর্তী প্রজন্মকে ভাল রাখার জন্য গাছ লাগিয়ে যাচ্ছেন। যাকে বলে সমাজ সেবা। মেঘনাদবাবু একজন প্রকৃত সমাজসেবী।

মেঘনাদবাবু খুব রেগে গেলেন। —আমাকে সমাজসেবী বলবেন না। এখন সমাজসেবী হল যারা এই পদবীটা সামনে রেখে সব সুযোগ-সুবিধা গুছিয়ে নেয়। কথা দিয়ে কথা রাখে না। সমাজসেবী আগে ছিল, যারা সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে মানুষের সেবা করত। যেমন মাদার টেরেসা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ। এখনও কিছু লোক আছে নীরবে সমাজ কিংবা প্রকৃতির সেবা করে যায়, তাদের বলুন সমাজসেবী।

আমাকে ফিরতে হবে। কথা না বাড়িয়ে বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন। এবার যাই।

মেঘনাদবাবু এবার ঠান্ডা হয়ে বললেন— দূর মশাই, কাদের সঙ্গে আমার তুলনা করে মাথাটা গরম করে দিলেন। চলুন এগিয়ে দিয়ে আসি।

ফেলে আসা মেয়েবেলার বিকেল

সুমিতা দেব

অসময়ের বৃষ্টির একটা আলাদা মজা আছে। এমনিতেই বৃষ্টি খুব প্রিয়। তারমধ্যে পড়ন্ত বিকেলে টিনের চালে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টির শব্দ আমাকে আমার মেয়েবেলায় নিয়ে যায়। বৃষ্টি পড়া মানেই ভাই আর আমার দস্যিপনা শুরু। মা, বাবা দু'জনেরই সোয়া ৯টা থেকে ৬টা পর্যন্ত অফিস। বাড়িতে দিদি, আমি আর ভাই।

বরাবরই আমার পাড়ার অলিগলি, দিনের শেষ পড়ন্ত আলোয় পাখিদের ঘরে ফেরার তাড়া, আর ভোরের প্রথম সূর্যোদয়ের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠা— এসবের মধ্যে আমার জীবনকে খোঁজার অনুভূতিটা নিজেকে ছাড়া কাউকেই বোঝাতে পারিনি। আসলে প্রতিটি মানুষ আলাদা প্রকৃতির হয়ে থাকে। এই আলাদা হওয়ার জন্যই মানুষের দিন যাপনে ঘটে যাওয়া সুখ-দুঃখের ঘটনাগুলো তাই এক একটা কবিতা, এক একটা গল্প আর এক একটা উপন্যাস রচনা করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমার মত অগোছালো লেখা বলে অপ্রকাশিত থেকে যায়। দিন যাপনের প্রতিদিনের জীবন মৃত্যুর যুদ্ধের এই টানাপোড়েনে নিজেই নিজের মনে যে কত সহস্র ছোট ছোট গল্প রচনা আমি করি, সেই গল্পের আমিই নিয়মিত পাঠক। যেতে তো একদিন হবেই, তা জেনেই প্রতিদিন বাঁচার লড়াইয়ে সকাল-সন্ধ্যা শামিল হই। এটাই জীবনের পরম সত্য।

শত কর্মব্যস্ততার মধ্যে আমরা যে জীবনের দৌড়ে রোজ অংশগ্রহণ করি হার-জিতের ফলের আশা না করেই। দিনের শেষে এই যে একটু 'আমার আমিকে' খোঁজার মুহূর্ত ধার নেই জীবন থেকে। বরাবরই আমি ঘুরে ফিরে যাই আমার ফেলে আসা স্মৃতির পথে ছোটোবেলার দিনগুলোতে। যেখানে আমি খুঁজে বেড়াই আমার মেয়েবেলার গন্ধ।

আমার জন্ম আগরতলায়। তবুও জানিনা কেন গ্রামের হাওয়া, গাছপালা, প্রকৃতি বরাবর আমার খুব চেনা, বড্ড আপন। তাই সুযোগ পেলেই সবুজের মাঝেই হারিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। পাড়ার গলিপথে ভাইয়ের সাথে মার্বেল, ডাংগুলি আর মায়ের ছুটির দিনে শনি-রবিবার দাঁড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট আর কানামাছি খেলতে খেলতে বড়ো হয়ে উঠা আমার। আমার জেঠুর বাড়ির বড় মাঠটি ছিলো আমাদের দস্যিপনার আস্তানা। সারা বিকেল মায়ের মতো দু-হাত মেলে দিয়ে অপেক্ষা করতো আমাদের। আমরা পাড়ার সব দাদা-দিদিরা ভাই-বোনেরা একসাথে খেলাধুলা করতাম। শৈশবের সেই মাঠ থেকে বহুকাল আগেই আমাদের সবার সোনালি দিনগুলো হারিয়ে গেছে। কৈশোরের বিকেলগুলোও রোজ একবার করে হাতছানি দিতো, কিন্তু পড়া গান খেলা, মা-বাবার অনুশাসন এসব নিয়ে এক অজানা প্রতিযোগিতায় নামার আশায় বারবার তাদের ফিরিয়ে দিয়েছি। আজ হয়তো তারই বদলা নিচ্ছে বিকেলগুলো আমাকে সময় না দিয়ে। সারাদিনের ক্লান্তির পর যখন হাঁপিয়ে উঠি, তখন আমি এখনো এক গন্তব্যহীন রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি একা একা বিকেল দেখার লোভে। কখনো বটতলা হাওড়া নদীর ব্রিজের ওপর নতুন একটি ফুট ব্রিজে, কখনো বিজয় নদীর পাড়ে আবার কখনো দেও-মনু সঙ্গমে। আমার মতো এমন অনেকেই হয়তো আছে, যারা নিজের শৈশব-কৈশোর বুকে চেপে আজও দাঁড়িয়ে আছে স্থিরভাবে। মাঝেমধ্যে আমার জীবনের

মেঘগুলো যখন আমাকে গ্রাস করতে চায়, তখন বেশিবেশি করে হারিয়ে যাওয়া মেয়েবেলার বিকেলগুলো মনে পড়ে।

গ্রামের বিকেলগুলো খুব সুন্দর দেখতে। গ্রামের সবার যেমন ভোরে উঠার অভ্যেস, ঠিক তেমনি দুপুরটা তাদের জন্য একটু বিশ্রামের সময়। আমার সেই দুপুর বিকেলের সন্ধিক্ষণটা দেখতে খুব ভালো লাগে। বিশেষ করে নদীর পাড়ে বসে পড়ন্ত রোদে মাখা বিকেলের মধ্যে ছোটোবেলার গন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় এখনো। বয়স যত বাড়ছে শৈশবের স্মৃতিগুলো ততোটাই বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সামনে দুর্গাপূজা। একটা আলাদা গন্ধ, আলাদা আকাশ, আলাদা বাতাস চারদিকে। সেই গন্ধে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম আজ আমার প্রিয়জনদের কাছে। যেখানে গেলে একটা আলাদা ভালো লাগা কাজ করে। সেই শৈশবের মাটির গন্ধ লাগা বিকেলের মতো। ট্রেনে করেই যাচ্ছি একা। আমার সঙ্গী আমি। এখানে বসেই আজ কতো কথা, কতো মান অভিমান আর ঝগড়ার পর গানের স্কুল সেরে বান্ধবীদের হাত, কাঁধে হাত দিয়ে বাড়ি ফেরার স্মৃতি মনে পড়ছে। হঠাৎ চোখ পড়ল জিরানীয়া স্টেশনের ইলেকট্রিক তারের পাশে অনেকগুলো পাখির কিচিরমিচির।

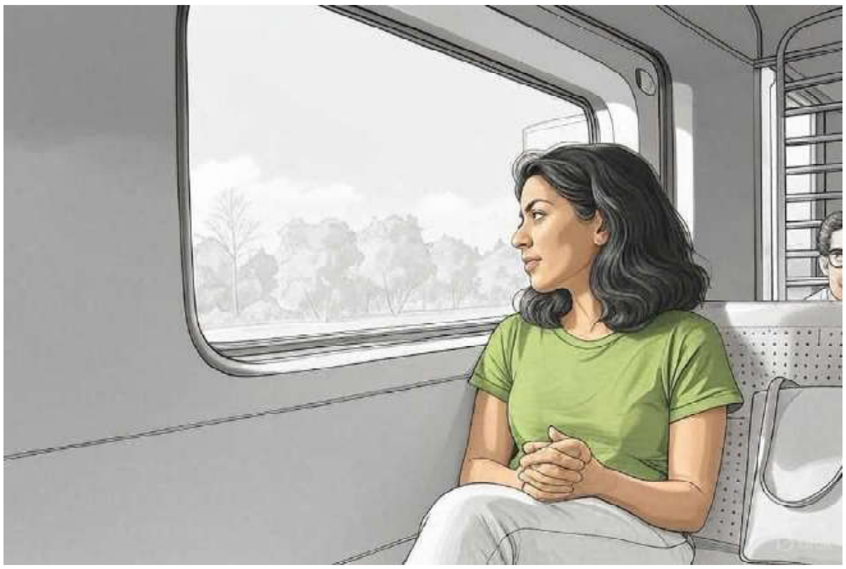

ভালো লাগছিল বেশ। কিন্তু হঠাৎ ঝগড়া নিজেদের মধ্যে। কি নিয়ে বোঝা মুশকিল। জানিনা কি ভাষায় ঝগড়া করে যাচ্ছে পাখিগুলো। হয়তো আমাদের মতো তাদেরও কোনো সমস্যা। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়ছে না। কথা বলার সুযোগ তো দূরস্ত। এদিকে সারাদিনের ক্লান্তির পর সূর্যও ক্লান্ত আমারই মতো। বেশ খানিকক্ষণ ঝগড়ার পর কিছু পাখি ভাগ হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম ওদের হয়তো ঝগড়া মিটে গেছে। কিছু পাখি বসে রইলো এখানেই। না, এখন আর কোনো শব্দ নেই। এই নীরবতার এক অদ্ভুত আকুলতা আছে। হঠাৎই অসময়ের কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি আমার কপালে এসে মিষ্টিভাবে ছুঁয়ে কোথায় চলে গেছে আর খুঁজে পেলাম না। হঠাৎ মনে হলো মেঘেরও আমার মত কষ্ট হয়। বোধহয় তার বুকে জমে থাকা অভিমান আকাশের বুকে কান্না হয়ে ঝরে পড়েছে আমাকে ছুঁয়ে।

ফোনের টুংটাং আওয়াজে খেয়াল হলো বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এবার তো ঘরে ফেরার পালা। আজ অনেক বছর পরে একটা গোটা বিকেল কাটালাম আমার প্রিয় বিকেলের সাথে। এই কিছুটা সময় এক মায়ায় বেঁধে ফেলেছিলো আমায়। উঠব এমন সময় চোখে পড়ল একটা ধবধবে সাদা পায়রা। কি অপলক দৃষ্টিতে সে দেখছে। মুহূর্তের মধ্যে বুকের ভেতরটা একটা শূন্যতায় ভরে গেল। এসব ভাবতে ভাবতেই ফোনে পাবলোর গলায় 'হ্যালো.. হ্যালো' শুনে সম্বিত ফিরল।

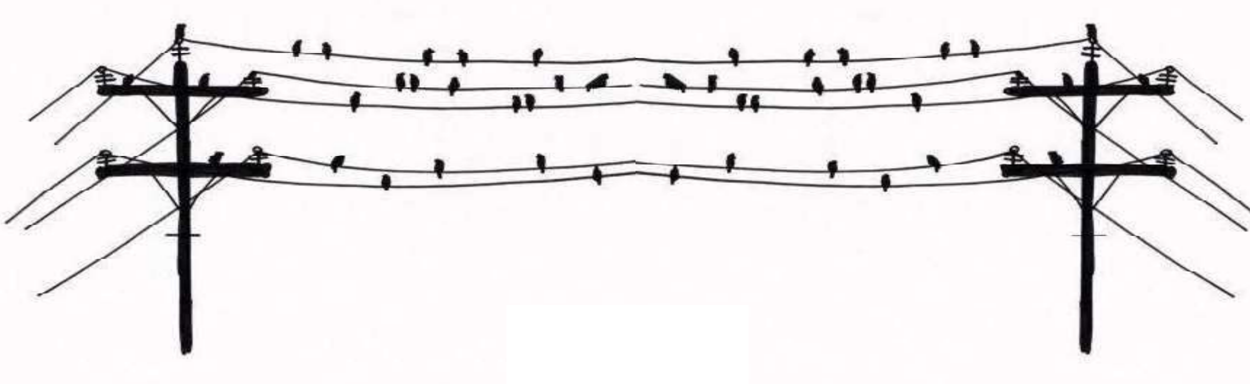

‘ঘুড়ি’

দীপক রঞ্জন কর

আমি আকাশের এক
রং কাগজের ঘুড়ি
মাঠ প্রান্তর ছেড়ে দিয়ে
নীল আকাশে উড়ি।
হাওয়ার সাথে চলে আমার
মনের গোপন কথা
হৃদয়ে লুকিয়ে রাখি
পরাধীনতার ব্যথা।
ইচ্ছে করে যেতে উড়ে
দিগন্ত আমায় ডাকে
পারিনি যেতে ছোট্ট ছেলে
লাটাই বেঁধে রাখে।
শিশুটির খুশিতে উড়ি সদা,
আমি তারই কাছে বাধ্য
ছেড়েও যেতে পারি না, ওরে
নেইকো সেই সাধ্য।
তার টানেই ফিরে আসি
আকাশ ছেড়ে ঘরে
বাধ্য হয়ে থাকতে হয়
তার লাটাই ধরে।
আমরা ঘুড়ি,আকাশে উড়ি
বিধাতার হাতের খেলনা
যেথা খুশি সেথা যাব ছাড়ি,
এ যে আর হয়না।

সাহসী ছেলে

ঋষভ চক্রবর্তী

পুলিশ দেখে ডরাইনে আর, পালাইনে কো ভয়ে,
আরশোলা বা ফড়িং এলে থাকতে পারি সয়ে।
অন্ধকারে রইতে পারি এই সাহসের গুণে,
আর করে না বুক ধুক-পুক জুজুর নামটি শুনে।

পাশের বাড়ির কুকুর দু'টি, বাঘার মত চোখ,
তাদেরকেও খাওয়াতে পারি, এমন আমার রোখ!
রাত্তিরেতে একলা শুয়ে তাও তো থাকি কতো —
মেঘ ডাকলে চ্যাঁচাইনে আর আহাম্মকের মতো!

এমন আরো অনেক জায়গায় সাহস আমার ফলে
সবাই বলে ‘খুব বাহাদুর’ কিংবা ‘সাহসী ছেলে’!
কিন্তু তবু শীতকালেতে সকালবেলায় হেন,
ঠাণ্ডাজলে নাইতে গেলে কান্না আসে কেন?

তখনই সব সাহস-টাহস কোথায় যে যায় উড়ে!
ষাঁড়ের মতো জোরে জোরে চ্যাঁচাই বিকট সুরে!!

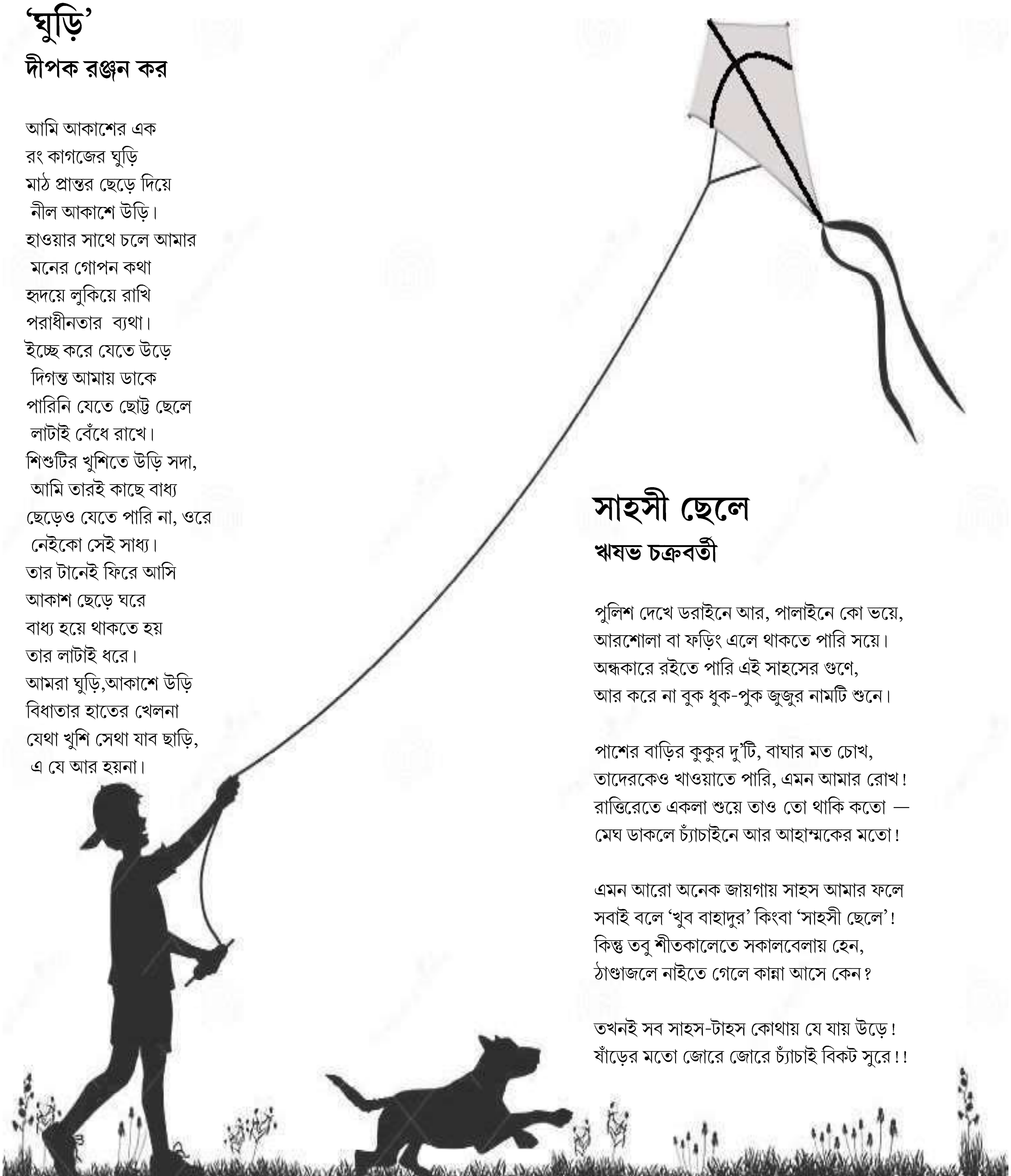

ভয়

প্রদীপ চক্রবর্তী

বিনুনি দুলিয়ে, কোমর হেলিয়ে
পাখিদের সাথে উড়ছে যে কিশোরী
ও কি জানে
অচিরেই ওর ডানা ঝাপটানোর সুরেলা শব্দ
পরিণত হতে পারে করুণ বিলাপে?

সুরম্য উপত্যকা, গভীর গিরিখাত
স্পষ্ট হয়ে অসূর্যস্পর্শা শরীর সুষমামন্ডিত হলে
কিশোরী কি বুঝবে
জোড়ায় জোড়ায় লোভাতুর চোখ দঙ্গল পাকিয়ে
সেখানে ঘুরে ভ্রমণ বিলাসের ছলে?

কোনো এক রাতে জ্যোৎস্নার ষড়যন্ত্রে
বারো বাই দশ ঘর অন্ধকারের আস্তাকুড় হলে
কিশোরী কি পারবে
বেলেল্লা মদ্যপের চাট হওয়া থেকে
শেষ সামর্থ্য নিংড়ে নিজেকে রক্ষা করতে?

কিশোরী জানে না
অচেনা এই অরণ্যের মধ্যে
ভয় তাকে দিগ্বিদিকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াবে।

মোবাইল ফোনের ব্যবহার

রাখী দেব

ভোর হতে না হতেই মোবাইল ফোন
সকলের হাতে হাতে।
ঘুরছে সবাই মোবাইল নিয়ে
পথে পাতে।
শিক্ষার চেয়ে শিখছে বেশি
নোংরা কাজকর্ম।
নাইকো আর শিক্ষার্থীর উপযুক্ত
কর্ম ও ধর্ম।
গ্রাস করে নিচ্ছে খারাপ,
প্রতি মুহূর্তে যুবসমাজকে,
ধিক্কার শুধু দিকে দিকে।
শিশুকালে ছেলেকে শান্ত করতে মায়েরা,
মোবাইলে বিভিন্ন ছবি ও কার্টুন দেখায়।
ছেলের মস্তিষ্ক ও চোখের ক্ষতির
নিমন্ত্রণ জানায়।
ব্যস্ত স্মার্ট মানুষ মোবাইল কানে ধরে,
পেরোয় রাস্তা।
দুর্ঘটনায় তার দেহটা হয়ে যায়,
অতীব সস্তা
জাগো শিক্ষার্থী,
জাগো যুব সমাজ, শপথ করো আজ
মোবাইলের সঠিক ব্যবহার করাই হবে
আমাদের মূল কাজ।

শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর

পারিজাত দত্ত

অনেকক্ষণ ধরে লোকটা ঘুরঘুর করছে গলিতে। গলিতে না বলে, বলা যায় মধুজাদের বাড়ির আশেপাশেই। আজ ছুটির দিন। এই সপ্তাহে পরপর তিনদিন ছুটি পাওয়া গেছে। প্রথম দু'দিন সারা সপ্তাহের জমে থাকা কাজ সারতে সারতে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। আজকের দিনটা একেবারেই তার নিজস্ব। গৌরাঙ্গকে গতকাল রাতেই বলেছে মধুজা, 'কাল সারাদিন যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াও, আমি জানতেও চাইব না। বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি যাও, ঝাঁটাপেটা কপালে না জুটলে বান্ধবীদের বাড়িও যেতে পারো। শর্ত একটাই, পা টলতে টলতে বাড়ি ফেরা যাবে না। বউয়ের শাসনের দড়ি ঢিলে হতেই চু-কিত-কিত করে গৌরাঙ্গ বিকেল হতে না হতেই বের হয়ে পড়েছে। দু'মেয়ে দরজা বন্ধ করে খুনসুটিতে ব্যস্ত।

বারান্দায় বসে মধুজা একমনে তাকিয়েছিল রাস্তার দিকে। শুনশান গলি। বিকেলের রোদ নরম হয়নি এখনও, শীতের হিমেল হাওয়া এখনও জড়িয়ে ধরেনি তাকে। এই সময়টা সত্যিই অন্যরকম। গৌরাঙ্গ খুব শৌখিন। বারান্দার সামনে টবে বাহারি ফুল। এবার শীতে প্যানজিগুলো দারুণ ফুটেছে। যেন রঙ-বেরঙের ছোট ছোট বিড়াল ছানারা উবু হয়ে বসে আছে। এবার রকমারি পিটুনিয়াও ফুটেছে, ফুটেছে নানা আকারের, নানা রঙের চন্দ্রমল্লিকা। ফুলে ঝলমল করছে যেন বাড়িটা!

মনটা ফুরফুর করছিল এতক্ষণ। মনের ভেতর বুদবুদের মত বুড়বুড়ি কাটছে গানের সুর। গুনগুন করে গাইছিল মধুজা। কিন্তু কিছুক্ষণ ধরে তার আত্মনিমগ্নতাকে চুরি করে নিয়ে গেছে পথচলা মানুষটি। উদ্দেশ্যবিহীন পথচলা নয়। লোকটির দু'চোখ আঁতিপাতি করে খুঁজছে কাউকে। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে আসল চেহারাটি খুঁজে পাওয়া ভার। দু'চোখের বিষাদ যেন গভীর থেকে গভীরতর এখন। সাদা পাজামার সঙ্গে হলুদ পাঞ্জাবি। ইস্ত্রি করা নয়, কিছুটা অবিন্যস্তও। ঝুপসি চুল ঘাড় পেরিয়ে কাঁধ ছুঁই-ছুঁই। সস্তার স্যান্ডেলের মশ-মশ আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

মধুজা জানে আড়চোখে তাকেই দেখছে মানুষটি। কিন্তু কোনও কথা বলার সাহস অর্জন করতে পারছে না। কিংবা কিভাবে শুরু করা যায়, তাই ভাবছে বোধহয় এখনও। আশেপাশে বাড়ি-ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। এই অলস বিকেলে কেউই ঘরের বাইরে নেই।

মধুজা লোকটার চোখে চোখ রাখল। এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষা যেন করছিল মানুষটি। দিব্যি সদর দরজা খুলে বারান্দার সামনে এসে দাঁড়াল।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?' ভীরু-ভীরু কণ্ঠে বলল মানুষটি।

'কি! বলুন।' অতিরিক্ত গাম্ভীর্য ফুটিয়ে উত্তর দিল মধুজা।

'না... মানে ... রণিতাদির বাড়ি এখানেই ছিল তো! খুঁজে পাচ্ছি না ঠিক।' এখনও গলা কাঁপছে মানুষটির।

ওহ! রণিতাদির খোঁজে এসেছেন মানুষটি! এবার অনেকটাই স্বাভাবিক মধুজা। যা দিনকাল পড়েছে না। একটু সতর্ক থাকা ভাল। রামনগরে আজকাল হামেশাই চুরি হচ্ছে। বিএসএফ এর চোখে ধুলো দিয়ে, আবার কখনও যোগসাজশেই সীমান্ত পেরিয়ে গোলচক্কর, রাজনগর হয়ে বাংলাদেশী চোরেরা

গত কয়েকদিনে বহু বাড়ি-ঘর চিচিং ফাঁক করে ফেলেছে। লোকাল চোরও আছে। ফেরিওয়ালা সেজে, কখনও পুরানো লোহা-লক্কড়ের ক্রেতা সেজে, ভিক্ষা করার ছলে নাকি চোরেদের চরেরা এসে ঘুরে ফিরে আতা-পাতা ছানবিন করে যায়।

তবে এই মানুষটিকে দেখে চোর-ছ্যাঁচোড় মনে না হলেও, মনে-মনে একটু সতর্ক হয়েইছিল মধুজা। রণিতাদির কথা বলায় এখন মনটা একটু নির্ভার হল তার। গৌরাঙ্গর জ্যেঠুর বড় মেয়ে রণিতাদি। রণিতাদি ডাকসাইটে সুন্দরী। খুব স্টাইলিস্ট ছিলেন কৈশোর থেকেই। এই শহরে রণিতাদিকে নিয়ে চর্চা হতো। বিয়ের পর সেই শৌখিন রণিতাদি সংসারের বৃত্তে নিজেকে দিন-দিন গুটিয়ে নিয়েছেন।

রণিতাদি শ্বশুরবাড়ি থেকে কালেভদ্রে আসেন এখানে। পাশের বাড়িটাই ওদের। এক সময় তো একটা বাড়িই ছিল। বাউন্ডারি ওয়ালও ছিল না। জ্যেঠু ও জ্যেঠিমা কিছুদিন আগে গুয়াহাটিতে ছোট মেয়ের কাছে বেড়াতে গিয়েছেন। এ মাসটি সেখানেই থাকবেন তাঁরা। বাড়ির সদর দরজায় বিশাল এক তালা ঝুলছে এখন।

ঠিক এমন সময়ই রণিতাদিকে খুঁজতে এল লোকটি! রণিতাদির বিয়ের প্রায় বছর দশেক পর! আজ এতদিন পর কেন? সন্দিগ্ধ চোখে লোকটির দিকে তাকাল মধুজা। হা করে এক দৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কেমন মন্ত্রাহত,আত্মমগ্ন যেন। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে সোজা তাকিয়ে আছে। গা শিরশির করে উঠল মধুজার।

'রণিতাদিকে কী করে চেনেন আপনি?' মধুজা একটু বিরক্ত হল এবার।

'আমরা একসঙ্গে পড়তাম।'

'রণিতাদির তো অনেক দিন হল বিয়ে হয়ে গেছে, এ-বাড়িতে থাকেনও না তিনি।' মধুজা ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল।

'হ্যাঁ ঠিকই। আসলে আমার অনেক দিন ধরেই রণিতার কথা মনে হচ্ছিল। কিন্তু আসা হয়নি। এবার ছুটি পেলাম তিন দিন, তাই ভাবলাম রণিতা কোথায় আছে একটু খোঁজ নিই।'

'রণিতাদি যদ্দুর মনে পড়ে মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়ে পড়তেন। তাই না?' মধুজা প্রশ্ন করে।

মধুজা জানে এত কথা বাড়ানোর কোনও মানেই নেই। তবুও আজকেই এই অলস মুহূর্তে কেন জানি না, তাকে কথায় পেয়ে বসেছে। একটা অপরিসীম কৌতুহলের ডানা পাখনা মেলে তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেন!

লোকটি মধুজার প্রশ্নে একটু আতান্তরে পরে গেল যেন! তারপর আস্তে-আস্তে বলল, 'হ্যাঁ। তাই। আসলে স্যারের বাড়িতে একসঙ্গে পড়তাম।'

'বাড়িটা মনে নেই বুঝি? আগে এসেছেন কখনও! ভাল বন্ধু ছিলেন আপনারা?' মধুজার তীর্যক প্রশ্নে কেমন যেন বেসামাল হয়ে গেল লোকটি।

একটু আমতা-আমতা করে জবাব দিল, 'ওই,একবার, নোটস খাতা নিতে এসেছিলাম তো। তাই বাড়িটা আর মনে করতে পারিনি।'

লোকটা সত্যি কথা বলছে তো! মধুজা নিষিদ্ধ উপন্যাসের গন্ধ পায় যেন! রণিতাদি সত্যিই অপরূপ সুন্দরী ছিলেন। মধুজা নিজেও কম সুন্দরী নয়! ছোটবেলা থেকে 'বাহ্, মেয়েটা কী সুন্দর!' একথা শুনতে-শুনতে বড় হয়েছে। কিশোরী হবার পর থেকেই আশেপাশের পুরুষদের চোখের ভাষা কেমন বদলে যাচ্ছিল। কতরকম দৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় শুরু! এ নিয়ে থিসিস হলেও হতে পারে। মুগ্ধতার প্রকাশের আতিশয্যে মধুজা একসময় হতাশ হয়ে পড়ল। কতরকমভাবে যে উত্যক্ত হতে শুরু হয়েছিল সে। মানসিক নির্যাতনই তো বলা চলে। এভাবে কারোর ভালবাসা পাওয়া যায়! পুরুষ মানুষ কেন যে বোঝে না! বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্যারের বাড়ি যাচ্ছে, রাস্তার পাশে রীতিমত মাঞ্জা দিয়ে দাঁড়িয়ে পাড়ার খোকনদা, মুখে মুচকি হাসি, চোখে ব্যাকুলতা, দেখলেই শরীর কেমন গুলিয়ে উঠত মধুজার। বেশি জ্বালিয়েছিল যে ছেলেটা, ছিপছিপে, ফর্সা, ভাসা-ভাসা দু'চোখ, সেই ছেলেটার নামও জানা হয়নি মধুজার। শুধু কলেজে যাওয়া-আসার সময় প্রায় দু'বছর দাঁড়িয়েই রইল। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা— বারো মাস। মুখে কোনও কথা নেই। শুধু দিনকয়েক দূর থেকে তাকে অনুসরণ করে বাড়ির কাছাকাছি নিঃশব্দে আসত। ব্যস্।

সবাই টের পেয়েছিল ঘটনাটা। ভাস্বতী, টুম্পা, পাপড়িরা মুখ টিপে হাসত। তাদের সেকশনের মলয় তখন মধুজার খুব ন্যাওটা। শুধু মলয় কেন, তখন মধুজার আশেপাশে সুকান্ত, কিংকর, দীপ অনেকেই ঘুরঘুর করত। সেদিন কী যে হল ছেলেটার! কলেজ থেকে ফেরার সময়ও রাস্তার পাশে নীরবে যে তার দিকে তাকিয়ে থাকত, সে সেদিন ভীরু-ভীরু পায়ে রাস্তা পার হয়ে এসে দিব্যি সুগন্ধী মাখানো গোলাপি খামটা তার হাতে দিয়ে দিল।

মধুজা ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে গেল। এমন কত চিঠি কতজন তাকে দিতে এসেছে। সে নেয়নি। সেদিন মধুজা এক ঘোরের মধ্যে কীভাবে যে চিঠিটা হাতে নিল, নিজেই জানে না সে। ছেলেটির হাত ছোঁয়া দূরত্বে মধুজা। ছেলেটি শুধু বলতে পেরেছিল, 'আমার নাম ...,' কথাটা শেষ হবার আগে কোথা থেকে যে মলয় এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল! চিঠিটা ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল। তারপর যেন রুদ্ররোষে ছেলেটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাগলের মত মারতে শুরু করল তাকে।

মধুজা থরথর করে কাঁপছিল। ছেলেটার ঠোঁটের দু'কষ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছিল, কেমন অসহায়ের মত তাকিয়েছিল মধুজার দিকে। মলয়কে জোর করে টেনে-হিঁচড়ে না আনলে খুন-খারাবি হয়ে যেত। মলয়ের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেবার পর ছেলেটি ধুঁকতে-ধুঁকতে চলে গিয়েছিল।

মধুজা ঘৃণাভরে দৃষ্টি মেলে মলয়কে শুধু বলেছিল, 'কোনওদিন আমার সঙ্গে কথা বলবি না তুই। লোফার কোথাকার।'

ছেলেটির অসহায় তাকানো আজও তার চোখে ভাসে। আরও একটা বিষয় মনে আছে, ছেলেটির হাত থেকে চিঠিটা নেওয়ার সময় দেখেছিল, তার বা হাতের কড়ে আঙ্গুলের নখ অদ্ভুত রকমের ছোট। ছ'মাসের শিশুর হাতের নখ যেমন ছোট্ট হয়, ঠিক তেমনি। ছেলেটিকে আর কোনওদিন দেখেনি মধুজা। আজ, এতবছর পর ঘটনাটি আবার মনে পড়ল তার।

মধুজা উত্তর দিচ্ছে না বলে লোকটা আবার বলল, 'একবারই এসেছিলাম তো। তাই বাড়িটা ঠিক চিনতে পারছি না। রণিতার ঠিকানাটা পাব?'

প্রিয় মানুষের বাড়ি কী মানুষ সত্যি ভুলে যায়! কত বছরের ব্যবধান? প্রিয় না হলে কী এভাবে খুঁজতে আসে কেউ! অচেনা মানুষের সঙ্গে ঝুঁকি নিয়ে আলাপ জমায়? মধুজা তো লোকটাকে মোটেও খাতির করছে না। তারপরও রণিতাদির খোঁজ নেওয়াটা কী আবেগসঞ্জাত নয়!

'রণিতাদি কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে থাকেন না। কোয়ার্টারে থাকেন। আমাদের সঙ্গেও যোগাযোগও নেই।' মধুজা খানিকটা বানিয়েই বলল। চেনা নেই, জানা নেই। কী দরকার! অপরিচিত মানুষকে রণিতাদির বাড়ির ঠিকানা দিয়ে ঢাক বাজিয়ে শনি কাঁধে আনার। বরং এই ভাল।

'ওহ্। তাই!' লোকটি বিমর্ষ হল যেন খানিকটা। তারপর দু'চোখ তুলে তাকাল আবার। ভাসা-ভাসা দু'চোখ। এ চোখের দৃষ্টি যেন বড় চেনা মধুজার।

যখন-তখন গৌরাঙ্গ ফিরে আসতে পারে। কিংবা মেয়ে দুটিও নীচে নেমে একজন অপরিচিতের সঙ্গে মাকে কথা বলতে দেখে হকচকিয়ে যেতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালের মেয়ে তো। আশেপাশের মানুষরাই বা কী মনে করবে!

মধুজা ইতস্তত করছে। এবার 'আপনি আসুন,' বলে হাতজোড় করে বারান্দার কলাপসিবল গেটটি টেনে দেবে কিনা ভাবছে মধুজা।

লোকটি কী মনের কথা টের পায়! আলগা হাসি ঝুলিয়ে বলল, "রণিতার সঙ্গে দেখা হলে বলবেন, স্নিগ্ধজিৎ মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন। বলবেন, আমার কবিতার বই 'তোমার সৌন্দর্য চোখে নিয়ে আমি চলে যাব' বেড়িয়েছে। জীবনানন্দের এক বিখ্যাত কবিতার শিরোনাম চুরি করলাম।"

হাতজোড় করে নিজেই বেরিয়ে পড়ল লোকটি, অর্থাৎ স্নিগ্ধজিৎ মুখোপাধ্যায়। এবারও ঘটনার আকস্মিকতায় থরথর করে কেঁপে উঠল মধুজা। লোকটি হাতজোড় যখন করল, কেন জানি না তার চোখ পড়ল লোকটির বা হাতের কড়ে আঙ্গুলটির উপর। কড়ে আঙ্গুলের নখটি অদ্ভুত রকমের ছোট। ছ'মাসের শিশুর হাতের নখ যেমন ছোট্ট হয়, ঠিক তেমনি। লোকটি যা বলে গেল রণিতাদিকে নিয়ে, সেসব কী আদৌ-সত্যি! সত্যিই কী রণিতাদির খোঁজে এসেছিল, নাকি। আর ভাবতে পারছে না মধুজা।

সেই কষ্টটা আবার ফিরে আসছে। একটি অসহায় ছেলের নির্মমভাবে মার খাওয়ার ঘটনাটি এবং পরে ধুঁকতে-ধুঁকতে অবসন্ন পায়ে ফিরে যাওয়ার দৃশ্যটি জেগে উঠছে, হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর থেকে এখন কড়া নাড়ার শব্দ শুধু শুনতে পাচ্ছে মধুজা, সেই চিঠিটার কুচি-কুচি করে ছেঁড়া অংশগুলো যেন হাওয়ায় উড়ছে, সেই শব্দগুলো যেন ভেসে বেড়াচ্ছে চারদিকে, কারওর হৃদয়ের অব্যক্ত ব্যথা-বেদনার-আকাঙ্ক্ষার গন্ধে ভেজা।

‘নারী তুমি সব্যসাচী’

বর্ণালী দাশগুপ্ত

সেদিন দুপুরে মোবাইল ঘাঁটাঘাঁটি করছি। এমন সময় আমার মোবাইলে মেসেজ এলো— ‘দিদি তোমার ফোন নম্বরটা দিও।’

দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ফোনের ওপাশ থেকে ভেসে এলো— ‘কেমন আছো দিদি? আমি মনিকা।’

বললাম— দারুণ। তুই কেমন?

মনিকা : ভালো আছি দিদি, আচ্ছা দিদি একটা কাজে ফোন করেছি।

আমি : হ্যাঁ বল্।

মনিকা : দিদি প্রতি বছর পুজোর সময় আমাদের ক্লাব থেকে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। এবার আমরা চাইছি, আমাদের স্মরণিকায় তোমার একটি লেখা থাকুক।

আমি জানতে চাইলাম— ‘আমরা বলতে?’

মনিকা : আমি আর পার্থ।

পার্থদা, মনিকার বর, আমার সাথে বহু আগে থেকেই পরিচয়। পার্থদার সঙ্গে পরিচয়ের গল্প সে না হয় অন্য আরেক দিন হবে। তবে, মনিকার কথা তো বলা হলো না।

মনিকা আমার কলেজের জুনিয়র, আমাদের চেনাজানা। তা আজ ২৫ বছর, কলেজ থেকে বেরোনোর পরে সেইভাবে কথা হয়নি। বহু বছর পর ফেসবুকের কল্যাণে আমরা আবার কাছাকাছি। বলতে পারেন অসম বয়সী বন্ধু আমরা।

তবে মেয়ের কথা শোনো! এত বছর পর ফোন করে একি চেয়ে বসলি—

‘তোদের স্মরণিকার জন্য আমার লেখা?’

মনিকা : হ্যাঁ দিদি তুমি পারবে। তুমি যে ফেসবুক-এ লেখালেখি করো তা আমরা পড়ি। আমি তোমার লেখার ফ্যান।

‘আমি কি কোনো লেখিকা?’

মনিকা : দিদি (আব্দার মাখা গলায়) না করো না।

মনে মনে ভাবলাম নেহাৎ ভালোবাসার সম্পর্ক না থাকলে এমন লেখার ভক্ত কেউ হয় না। অত্যন্ত নিরুপায় হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কবে দিতে হবে লেখা? বলল এই আগস্ট মাসের মধ্যে।

আমি বললাম— কথা দিতে পারছিনা, তবে চেষ্টা করবো।

কি লিখি? কোনো বিষয় বস্তুমাথায় নেই। এর মধ্যে ছেলের পরীক্ষা, প্রোজেক্ট এসাইনমেন্ট, ক্লাস টেস্ট সব ঘেঁটে-ঘ। ঠিক তখনই মোবাইল বেজে উঠলো, ফোনের ঐ প্রান্তে, কি হলো ক’দিন ধরে প্রাতঃভ্রমণে আসছো না?

আমি : ছেলের পরীক্ষা চলছে গো পিয়ালি। তাই ক’দিন ধরে ব্যস্ততা বেড়ে গেছে।

ও পিয়ালির পরিচয় তো জানা হলো না। পিয়ালি আমার প্রাতঃভ্রমণের বন্ধু। আরও আছে। আমাদের প্রাতঃভ্রমণের গ্রুপের মধ্যে কতো গল্প

হয়। এ আমাদের এক অন্য জগৎ। আমরা সবাই যখন একসঙ্গে হই, আমাদের ক্লান্তি কেটে যায়। আমরা এই গ্রুপের সবাই চল্লিশ ঊর্ধ্ব। এই বয়সীদের জীবন এক অন্য গতিতে চলছে। কথায় আছে — 'নারী তুমি অর্ধেক আকাশ।'

কতো নারী দিনের পর দিন এই আকাশটাকেই দেখতে পান না। অন্দর মহলের প্রহরী করে রেখেছে তাকে। কিন্তু তার অন্তরের কথা শোনে ক'জন? যে মেয়েটি কোনো এক সময় চলনে-বলনে চঞ্চল স্বভাবের ছিলো, পরোয়া করতো না কাউকে, সে এখন ঠাণ্ডা মাথায় পুরো পরিবারকে সামলায়।

যে মেয়েটি বেলা করে ঘুম থেকে উঠতে পছন্দ করতো, সে এখন সূর্য ওঠার আগেই নিজেকে ওঠায়। কিন্তু তার কাজের তাড়ায় সূর্য কখন মধ্য গগনে জায়গা করে নেয়, তার খোঁজও নেই তার।

যে মেয়েটি সকাল-সন্ধ্যা শরীরচর্চায় নিজেকে ব্যস্ত রাখতো, সে এখন রোদে কাপড় তুলতে আর ছড়াতেই হাঁপিয়ে উঠে।

ব্যতিক্রম তো সব জায়গাতেই আছে, কিছু সংখ্যক নারী অন্দর মহলের ঐ একচিলতে জানালাটাকে খুলে দিয়েছেন আজ। এখন এই সময়ে দাঁড়িয়ে বেশীরভাগ মেয়েরাই প্রতিবাদ করতে শিখছেন। আকাশ থেকে পাতাল আজ কোথাও মেয়েরা লুকিয়ে নেই। নারীরা আজ ঘোমটা সরিয়ে লাইট... ক্যামেরা... অ্যাকশন... এর মুখোমুখি হচ্ছেন। খুন্তি ফেলে বন্দুক ধরতে শিখেছেন। ঘরে বাইরে সমান তালে নিজেকে তুলে ধরছেন। তাহলে মানতে তো কোনো দ্বিধা নেই— নারী তুমি সব্যসাচী।

কথায় আছে, 'মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি।' এটা যেমন বিশ্বাস করিনা, তেমন চল্লিশ পেরোনোর পর মেয়েদের বার্ধক্য আসে সেটাও কোনোভাবেই বিশ্বাস করিনা। যারা যারা আমারই মতো চল্লিশ পেরিয়েছেন, তাদের অভিজ্ঞতা হয়তো অনেকটা এমন—

"আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুদ...
আমরা নতুন যৌবনেরই দূত..."

চল্লিশ মানে, জীবনের সূর্য এখন মধ্য গগনে, জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা এখন প্রচুর। ভালো মন্দ তো অনেক দেখা হলো, এবার তবে বলতে শিখুন—

" আমার বয়েই গেছে"

অনেক তো সংসার হলো, অনেক হিসেবের খাতায় কাটাকুটি হলো। সবার কথা ভাবা হলো, কিছুটা সঞ্চয় হলো। তাই এখন চল্লিশ মানে উপভোগ করুন, আঃ হাঃ —

" আজ কি আনন্দ আকাশে বাতাসে..."

জীবন থেকে শেখা চল্লিশ মানে, নীরবতার প্রেমে পড়া। সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে নতুন করে বাঁচতে শেখা। চল্লিশ মানে অনেক সময় নষ্ট হলো, এবার নিজের জন্য ভাবা। প্রতিটি মুহূর্তকে উপভোগ করা, জীবনের যতটা মাইলস্টোন পার করে নিলাম, আরও ততটুকু পার করার সময় হয়তো অনেকেরই হাতে নেই। তাই 'দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে' সিনেমার সেই বিখ্যাত উক্তিটি প্রযোজ্য —

'যা সিমরন্ যা, জীলে আপনে জিন্দেগী,
ক্যায়া পাতা কাল হো না হো।'

কে বলে মেয়েদের কোনো গল্প নেই? খোঁজ নিলে জানা যাবে প্রতিটি মেয়ের জীবনেই রয়ে গেছে কিছু অকথিত গল্প অর্থাৎ আনটোল্ড স্টোরি।

জিজ্ঞাসা

লীলা চক্রবর্তী

নারী অবলা!
বল বীর, নারী কী অবলা ?
নারী বোঝা বইতে জানে।
দুঃখ ব্যথা সইতে জানে।
দেশের জন্য লড়তে জানে।
দেশকে সে গড়তে জানে।
চেয়ে দেখো মহাকাশে নারী।
পর্বত শিখরে বিজ্ঞানাগারে,
আত্মত্যাগে,সেবা কর্মে নারী,
নারী পাইলট,নারী চিকিৎসক।
নৃত্য শিল্পী সুর সম্রাজ্ঞী
নারী কবি প্রবন্ধকার।
নারী অভিনেত্রী,নারী ব্যবসায়ী।
নারী দিনমজুর, নারী চাষী।
নারী অত্যাচারী ডাকাতদলের রাণী।
নারী অসুর নাশিনী।
নারী দেহ বল বুদ্ধি বলে পরিপক্ক।
এই পৃথিবীর, সকল কাজে যোগ্য নারী।
বল বীর, বল , নারী কী অবলা ?

আশায়

মৌসুমী কর

থৈ থৈ নদীটা কালের বিবর্তনে
আজ শুধুই বালুচর
কত নারী তার ঘাট থেকে
কলসি ভরতো,
কত পাল তোলা নৌকো
তার বুকে ভেসে যেতো,
নদীর নিত্যতার নেশাতে মাতাল হয়ে
তৈরী হতো কত কবিতা
আজও পাখিটা বালুচরে এসে
অনবরত ঠোকরায়
ঠোঁটে একটু জিয়ল মাছের
স্বাদ পাবার আশায়।
খড়কুটো ধরে যেমনটা মানুষ
ভেসে চলে
গন্তব্যের আশায়।

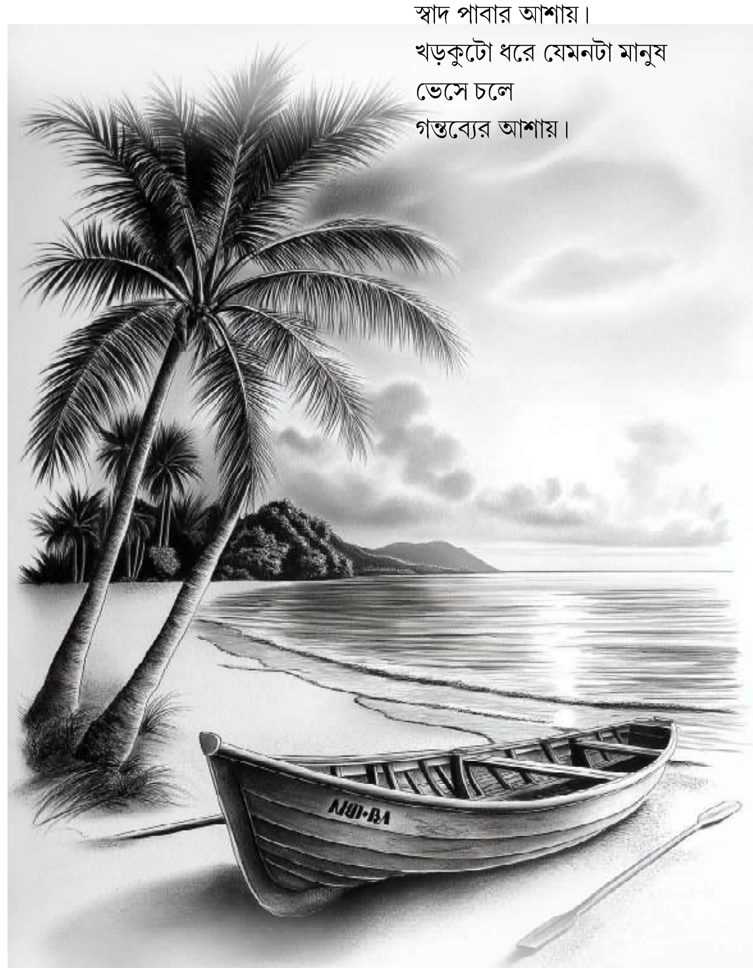

দৃষ্টিভ্রম

শুভদীপ দাশগুপ্ত

ভূগোলক তোমার দুটি চোখে দেখেছিলাম,
দেখেছিলাম মহাবিশ্ব - শূন্যে আকাশ
ছবির মতো আকাশ, দূর - সুদূরে —
দিগন্তের দেশে
খোলা মাঠের শেষে
আকাশের অনেক নীচে মাটির ঘরে,
মৃত্তিকার বসবাস - অবহেলার আবাস
একেবারেই নগণ্য - গৌণ
ধর্তব্য নয় মোটেই
কোথায় মাঠ আর কোথায় আকাশ
নেহাৎ যারা মাটির মানুষ
গায়ে মেখে মাটির ধুলি
মাটির বুকে দাঁড়িয়ে বলি
ওগো, আকাশ দেখো ছুঁয়েছে মাটি
প্রান্তরের প্রান্তে, অবলীলায় অজান্তে
তুমি কেবল ভুল করো বারে বারে
চোখের তারায়, হাত ইশারায়
ঐ যে দূরে দেখো তুমি
সীমানার পটে শতাব্দীর প্রত্যাশা
ওটা তোমার দৃষ্টিভ্রম, জানো—
শোনো একটা কথাই খাঁটি
আকাশ কখনো ছুঁয় না মাটি !

আগমনী

জয়ন্তী চৌধুরী

মা আসবেন
কত আনন্দ মনে,
আকাশে বাতাসে আগমনীর গন্ধ,
সবাই আমরা খুশিতে মগ্ন,
কিন্তু যখন দেখি রাস্তার পাশে
একটি শিশু একটু খাবারের জন্য
হাত পাতছে,
তখন কোথাও আনন্দ চলে যায়
কষ্ট হয়।
আমরা এই পথ শিশুদের
মায়ের আগমনে
একটু আনন্দ দিতে পারি না ?
যখন দেখি চারিদিকে অন্যায় আর অন্যায়,
পারি কি রুখে দাঁড়াতে ?
দুঃখ বেদনা থাকবেই,
থাকবে লড়াই,
শক্তি খুঁজে পাই মা আসবেন বলে,
মাগো এসো তুমি
মঙ্গল করো সবার,
আশীর্বাদ করো মাগো
রেখো মাথায় হাত,
দুঃখ কষ্ট দূর করো মাগো,
প্রণাম জানাই বার বার

রামায়ণের রামচন্দ্র কি শূদ্র দলিত বিরোধী ?

অভিজিত দেব

আজকের বৌদ্ধিক আলোচনায় রামচন্দ্রকে শম্বুক হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। বলা হয় শম্বুক শূদ্র ছিলেন, তাই শূদ্রদের প্রতি রামচন্দ্রের এ যেন এক প্রবল বঞ্চনার ইতিহাস। বর্তমান যুগে দাঁড়িয়েও ভারতের অগণিত জনমানুষের মনে রামায়ণের যে একটি সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছায়া রয়ে গেছে, সেখানে শম্বুক হত্যা যেন একটি কলঙ্ক বা কালো দাগ। বিগত কিছুদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়াতেও নতুন করে রামচন্দ্রের শম্বুক হত্যার বিষয়টি উঠে আসছে। এজন্যই এ তথ্যগুলো তুলে আনা দরকার।

আলোচনার শুরুতে উল্লেখ করা দরকার যে, শম্বুক হত্যার বিষয়টি রয়েছে রামায়ণের উত্তরকাণ্ড-এর (৭৩-৭৬) সর্গে। তবে অনেক পুরাণকার ও বিশেষজ্ঞদের মতে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডটি প্রক্ষিপ্ত। মূল বাল্মীকি রামায়ণে উত্তরকাণ্ড নেই,শম্বুক হত্যারও কোনো উল্লেখ নেই। তাছাড়া এই বিশ্লেষণ লিখতে শুরু করার আগে ব্যক্তিগতভাবে গীতাপ্রেস থেকে প্রকাশিত বাল্মীকি রামায়ণের বাংলা অনুবাদ পড়েও শম্বুক হত্যার ঘটনাটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফলে রামায়ণের উত্তরকাণ্ড যে প্রক্ষিপ্ত তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। তবে শম্বুক হত্যা যতই প্রক্ষিপ্ত হোক, রামায়ণের প্রধান চরিত্র রামচন্দ্রের সঙ্গে জড়িত এই ঘটনাটিকে সত্য ধরলেও এর মধ্যে একটি আলোকিত দিক রয়েছে। কী সেই উজ্জ্বল দিক, সে আলোচনায় যাওয়ার আগে শম্বুক হত্যার পর্ব সংক্ষেপে উল্লেখ করা দরকার।

সেখানে বলা হয়েছে, একদিন এক ব্রাহ্মণের পুত্র মারা যায়। সেই ব্রাহ্মণ তার পুত্রের শবকে নিয়ে রাজদ্বারে এসে বিলাপ করতে লাগলেন। তার অভিযোগ ছিল বালকের অকাল মৃত্যুর কারণ রাজার কোন দুষ্কর্ম। ঋষি-মুনিদের পরিষদ এর বিচার করে নির্ণয় করেন যে, রাজ্যের কোথাও কোন অনধিকারী তপ করছে। শ্রীরামচন্দ্র এ বিষয়ে বিচার করার জন্য মন্ত্রীকে খোঁজ করতে বললেন। দেবর্ষি নারদ সে সভায় বললেন, রাজন— দ্বাপরেও শূদ্রের তপ হওয়া মহান অধর্ম। নিশ্চয় আপনার রাজ্যের সীমানায় কোন ক্ষুদ্র বুদ্ধিসম্পন্ন শূদ্র তপস্যা করছে। তাই বালকের মৃত্যু হয়েছে। এটা শুনে শ্রীরামচন্দ্র পুষ্পক বিমানে সওয়ার হয়ে শূদ্রের খোঁজে বের হলেন এবং দক্ষিণ দিশায় শৌবল পর্বতের উত্তরভাগে এক সরোবরের পাশে তপস্যারত তপস্বীর দেখা পেলেন যিনি গাছ থেকে মাথা নীচে দিয়ে উল্টো হয়ে ঝুলে তপস্যা করছিলেন। তাকে দেখে রামচন্দ্র উগ্রতপকারী সেই তপস্বীর কাছে গিয়ে বললেন— উত্তম-তপ পালনকারী তাপস, তুমি ধন্য হও। তপস্যা দ্বারা সুদৃঢ় পরাক্রমী পুরুষ, তুমি কোন্ জাতি থেকে উৎপন্ন হয়েছো? আমি দশরথ-কুমার, তোমার পরিচয় জানতে চাই। তুমি কী বস্তু পাওয়ার জন্য তপ করছো? তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট করে ইষ্টদেব দ্বারা তুমি কোন্ বর পেতে চাইছো? স্বর্গ বা অন্য কিছু? কোন্ সেই পদার্থ যা পাবার জন্য তুমি এরূপ কঠোর তপস্যা করছো যা দ্বিতীয় জনের জন্য দুর্লভ? তাপস! যে বস্তুর জন্য তুমি তপস্যা করছো তা আমি শুনতে চাই। তুমি বল যে, তুমি ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয়? তৃতীয় বর্ণের বৈশ্য, না শূদ্র?

রামের এই বচন শুনে তপস্বী শম্বুক বললেন— হে শ্রীরাম, আমি মিথ্যা বলব না। দেবলোক পাবার জন্যই আমি তপস্যা করছি। আমাকে শূদ্র বলেই জানবেন। আমার নাম শম্বুক। এরপরই রামচন্দ্র তার তলোয়ার বের করে শম্বুকের শিরচ্ছেদ করলেন। এই হল ঘটনা, এবং এতেই রামচন্দ্র শম্বুক হত্যার দায়ে কলংকিত।

এখন বিষয় হল, এক ব্রাহ্মণ পুত্রকে রক্ষা করার জন্য ব্যক্তিগত শত্রুতা ছাড়াই রাম এক শূদ্র তপস্বী শম্বুককে হত্যা করেছিলেন। বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে ভাবলে শাসকের এরূপ আচরণ নিন্দনীয় ঠিকই, তাই বর্তমান সমালোচকরা এ কার্যের জন্য রামের নিন্দা করে থাকেন। তাঁকে শূদ্র তথা দলিত বিরোধী প্রমাণ করার চেষ্টাও করেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে বর্তমানকাল হল কলিযুগ, আর রাম এ কার্য করেছিলেন ত্রেতাযুগে। ত্রেতাযুগের নিয়মই ছিল কোনো শূদ্র তপস্যা করতে পারবে না। তাই রামচন্দ্র এই তপস্বীকে হত্যা করে যুগোপযোগী কাজই করেছেন।

এখন তবে প্রশ্ন উঠবে, রাম কি যুগোত্তীর্ণ নন? যদি- তা না হন, তবে তাঁকে কলিযুগে আমরা আদর্শ হিসাবে মানব কেন? এর উত্তরে বলা যায়, রামচন্দ্র এমন একজন শাসক যিনি যুগের নিয়ম অনুযায়ী দেশ শাসন করেছেন। ত্রেতাযুগের নিয়ম ছিল শূদ্র তপস্যা করতে পারবে না। সমাজের এই

'সিস্টেম'কে আজকের আধুনিক সমাজ মানবে না এটা ঠিক। কারণ আমরা ত্রেতাযুগ পেরিয়ে কলিযুগে চলে এসেছি। কিন্তু তাই বলে ত্রেতাযুগের কোনো ঘটনাকে বিশ্লেষণ করতে হলে আজকের আধুনিক যুগের প্রেক্ষিত টানলে হবে না। ত্রেতাযুগের কাজের বিশ্লেষণ করতে হবে ত্রেতাযুগের মানসিকতা নিয়েই। তাই বলা যায়, রামচন্দ্র যুগের যা নিয়ম ছিল সে নিয়ম মেনেই কাজ করেছেন। ঠিক একইভাবে আজকের যে শাসক রামকে দেখে শিক্ষা নেবেন, তিনি ত্রেতাযুগের নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্র শাসন করবেন না, বরং কলিযুগের তথা আজকের নিয়ম বা রাষ্ট্রীয় সংবিধান মেনেই রাষ্ট্র শাসন করবেন। কিন্তু আজকের শাসকরা, দেখা যাচ্ছে, আইনকানুন না মানতেই যেন অধিক আগ্রহী। কিন্তু রামচন্দ্র সেখানে ব্যতিক্রম। রামচন্দ্র থেকে আমরা তাই যুগের আইন মেনে চলার শিক্ষা পাই।

এরপর যে প্রসঙ্গ আসে তা হল, রামের শূদ্র বিরোধী বা দলিত বিরোধী আচরণ। তিনি দলিতকে মেরে ব্রাহ্মণকে বাঁচান এই হল আলোচনা। দলিত স্টাডিজ নিয়ে যারা গবেষণা করেন তারা এটাকে কাজে লাগান দলিতদের রামের বিরুদ্ধে এককাট্টা করতে। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে আদৌ এই অভিযোগ সত্য কি?

প্রথমত: শম্বুক হত্যার পরেও অন্যান্য যেসব শূদ্র রাজ্য ছিল— তারা রামের বিরুদ্ধে কোনো গণবিদ্রোহ করেননি। রামায়ণে এমন কোনো ঘটনার উল্লেখ নেই। তৎকালীন সময়ের ঋষিগণ, যাঁদেরকে আজকের সমাজে বুদ্ধিজীবী বলে— তাঁরাও কিন্তু শ্রীরামের এই পদক্ষেপকে সমর্থন করেছিলেন। উদাহরণ ব্রহ্মর্ষি অগস্ত্য, যিনি ঋগ্বেদের ভাষ্য রচনা এমনকী তামিল ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন— তিনিও রামের এই বিচার সমর্থন করেছেন। তাছাড়া রামায়ণে শম্বুকই একমাত্র দলিত বা শূদ্র নন। রামের সঙ্গে বহু দলিতেরই সাক্ষাৎ এবং বন্ধুত্ব হয়েছিল। এরমধ্যে উল্লেখ্য নিষাদরাজ গুহ, যিনি শ্রীরামের পরম মিত্র ছিলেন। বনবাসে যাবার সময় তাঁর রাজ্যে শ্রীরাম এক রাত কাটান। আবার ফেরার সময়ও তাঁর সঙ্গে শ্রীরামের সাক্ষাৎকার ঘটে এবং পরস্পর ভাব বিনিময় হয়। শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের সময়ও নিমন্ত্রিত ছিলেন এই নিষাদ রাজন।

অরণ্যকাণ্ডের একেবারে শেষে আমরা আরেক শূদ্র নারীকে দেখতে পাই যাঁর নাম শবরী। শবরী ছিলেন মতঙ্গ মুনির আশ্রমের পরিচারিকা। তিনি নিম্নবর্গীয়, শবর। কিন্তু তাঁর ভক্তিই তাঁকে শ্রীরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটায়। গোস্বামী তুলসীদাস 'রামচরিত মানস' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন শবরীর রামভক্তির কথা। শ্রীরাম শবরীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। শবরীর সংগ্রহ করা বুনোফল শবরীর পর্ণকুটীরে বসে গ্রহণ করেন এবং তাঁর সাধনা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন (অরণ্যকাণ্ড, সর্গ ৭৪-৭৫)। মাতা শবরী শ্রীরামের সামনেই অগ্নিতে আহূতি দিয়ে স্বর্গধামে যাত্রা করেন। এটাই ছিল তাঁর ইষ্টলাভ। ফলে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে দলিত অত্যাচারের এই অভিযোগ অসত্য নয় কি? শম্বুক হত্যার কারণ হিসাবে যদিও তৎকালীন যুগের বিধিভঙ্গের কথাই আমরা রামায়ণে পেয়ে থাকি, তবুও রাম এবং শম্বুকের কথোপকথন কিন্তু শম্বুকের চরিত্রের একটি খারাপ দিককে সামনে নিয়ে আসে। তা হল শম্বুকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। শম্বুক শুধু সশরীরে স্বর্গলোক পৌঁছতে চেয়েছিলেন তা-ই নয়, তিনি দেবলোক জয় করার ইচ্ছা শ্রীরামের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। এরূপ দেবলোক জয় করার ইচ্ছা আমরা দেখি অসুরগণ যেমন রাবণ, ইন্দ্রজিৎ বা কুম্ভকর্ণের মধ্যে। কুম্ভকর্ণের তপস্যার উদ্দেশ্য ছিল ইন্দ্রাসন। ভুল করে তিনি ব্রহ্মার কাছে নিদ্রাসন চেয়ে বসেন (সে সময় দেবী সরস্বতী তাঁর জিহ্বায় অবস্থান করেন)। রাবণ তো দেবলোক আক্রমণই করেন আর ইন্দ্রজিৎ তাঁর নাম প্রাপ্ত হন ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, দেবলোক জয় করার আসুরিক ইচ্ছা শম্বুকের মধ্যে ছিল। কুম্ভকর্ণও একই উদ্দেশ্য নিয়ে ব্রহ্মার তপস্যা করেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের পরামর্শে দেবী সরস্বতী স্বয়ং কুম্ভকর্ণের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে দেননি। রামের আচরণও শম্বুকের এই উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হতে দেয় না। তাই রামচন্দ্র দলিত শূদ্রকে মেরে ব্রাহ্মণ সন্তান হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন— এই আপ্তবাক্য যথাযথ কি না সেটা বিচার করবার ভার পাঠকদের উপর রইল।

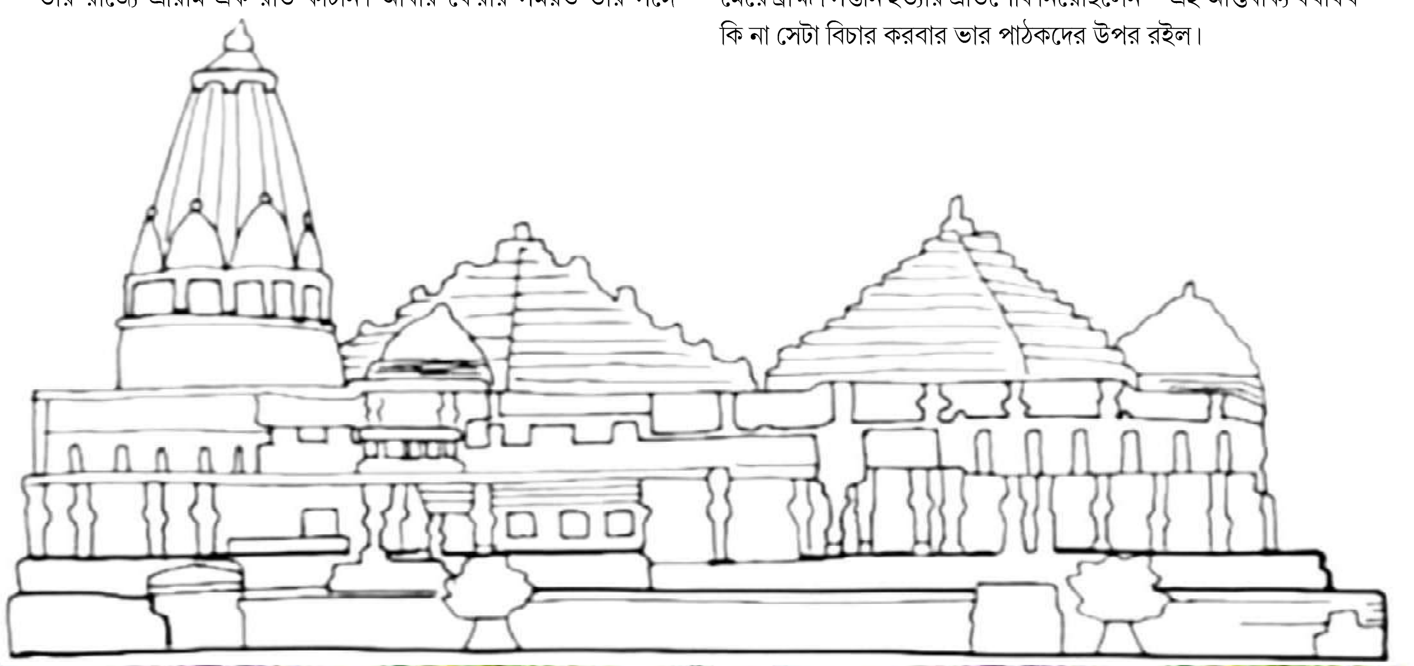

প্রাচীন ত্রিপুরার দুর্গা ও দেবী দুর্গার দু'হাতের রহস্য

সুব্রত সাহা

ত্রিপুরায় দুর্গা পূজার প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। কোন্ সময় থেকে এই দুর্গা পূজার প্রচলন হয়েছিল তা বলা দুষ্কর। তবে দুর্গা পূজার প্রচলনের সাক্ষ্য বহন করে ত্রিপুরার মুদ্রা শিলালিপি ও পাথর। ত্রিপুরা মিশ্র সংস্কৃতির রাজ্য হলেও বাঙালি ও পাহাড়ির সংমিশ্রণে এক অভূতপূর্ব যোগসূত্র গড়ে উঠে। প্রাচীনকাল থেকেই যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে রাজ আমল থেকে। অনেক ঘাঁটাঘাঁটির পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে, ত্রিপুরায় দুর্গা পূজার প্রথম নিদর্শন মেলে ত্রিপুরার রাজবংশের কুলদেবতা চতুর্দশ দেবতার মন্দির থেকে। কথিত আছে যে, ত্রিপুরার চতুর্দশ দেবতার মন্দির ত্রিপুরার রাজবংশের মহারাজ ত্রিলোচন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ত্রিপুরার রাজবংশের কুলদেবতা হিসাবে চতুর্দশ দেবতা প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত পূজিত হয়ে আসছেন। এই চতুর্দশ দেবতার অন্যতম দেবী হলেন মা দুর্গা। ঐ সময় যুদ্ধ যাত্রাকালে ত্রিপুরার রাজারা শক্তির দেবী দুর্গাকে পূজা করতেন। অর্থাৎ মহারাজা ত্রিলোচনের সময়েই প্রথম দুর্গাপূজা প্রচলন হয়েছিল বলা যেতে পারে, যদিও তা বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়।

ত্রিপুরার রাজা রত্নফা প্রাম মাণিক্য উপাধি গ্রহণ করেন এবং ১২৮৬ শকাব্দে (১৩৬৪ খৃঃ) তিনিই প্রথম মুদ্রা তৈরী করেন। তার মুদ্রা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তার মুদ্রায় লেখা আছে "শ্রী দুর্গা রাধানাপ্ত বিজয় রত্নপুরে।" মহারাজ বিজয় মাণিক্যের অভিষেকের মুদ্রা এখনও আবিস্কৃত হয়নি। তবে বিজয় মাণিক্যের যেসব মুদ্রা পাওয়া গেছে তার মাঝে এক প্রকার মুদ্রায় দশভূজা দুর্গা ও চতুর্ভূজ শিবের অর্দ্ধাংশ দিয়ে তৈরী এক বিচিত্র অর্ধনারীশ্বর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই অভূতপূর্ব মূর্তিটির পাঁচটি হাত দুর্গার অংশজাত সিংহের উপর ও দুটি হাত শিবের অংশজাত বৃষের উপর। কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত 'শ্রী রাজমালায়' বিজয় মাণিক্যের লাক্ষ্যস্ময়ী স্মারক মুদ্রাটি সর্বপ্রথম উল্লিখিত দেখা যায় যে মুদ্রাটির মুখ্য দিকের লিপি লাক্ষ্যস্ময়ী/শ্রীশ্রী ত্রিপুরম/ বিজয় মাণিক্য দেব শ্রী লক্ষ্মীবালা দেবী, গৌন দিকে উৎকীর্ণ উপরে মহিষাসুরমর্দ্দিনী মূর্তি। নিচে বামদিকে মহিষ ও দক্ষিণ পার্শ্বে সিংহমূর্তি। এই মুদ্রা শিলালিপিগুলি থেকে ত্রিপুরার দেবী দুর্গার নিদর্শনের প্রমাণ মেলে।

মহারাজা রাজধর মাণিক্যের আমলে সম্ভবতঃ ১৭৮৫ থেকে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পণ্ডিত রামগঙ্গা শর্মা কৃষ্ণমালা পুঁথিটি রচনা করেন। সে

বইয়ে আছে রাজা কৃষ্ণমণি যখন হিড়িম্ব দেশে বাস করছেন, তখন কুকি প্রজারা এসে কৃষ্ণমণিকে বলল— তুমি আমাদের রাজা, আমরা তোমার প্রজা। তুমি আমাদের মাঝে এসে বাস কর। রাজা তাদের সঙ্গে বরবক্র নদীর তীরে বাস করতে এসে দেখেন সেখানে দেবী দুর্গার একটি মন্দির। পূর্বে কোনো এক ত্রিপুর নৃপতি এখানে এ মন্দির স্থাপন করেন। দুর্গার বর্ণনায় আছে —

"সিংহ পৃষ্ঠে আরোহণ ধায় দশকর
দেবী নামে পূজায় তান হয় পূর্বার
দুর্গোৎসবকালে তথা যত কুকিসব
অবয়াদি বলি দিয়া করায় উৎসব।"

কুকিদের মানে এই যে হিন্দু ধর্মের প্রসার এবং হিন্দু দেবীর পূজা এদের মধ্যে চলছিল তা 'কৃষ্ণমালা' পুঁথি থেকে জানা যায়।

ত্রিপুরার বড়মুড়া পাহাড়ের গায়ে কতিপয় মূর্তি অঙ্কিত অবস্থায় আছে, তার মধ্যে একটি মহিষমর্দিনী দুর্গার প্রতিমূর্তি খোদিত আছে। সে স্থানটি দেবতামুড়া নামে পরিচিত। হিন্দু রাজ্য ত্রিপুরের রাজা যযাতি মগদের পরাজিত করে বৌদ্ধ রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটিয়ে হিন্দু রাজ্য স্থাপন করেন। তারই স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে দেবতামুড়ার মূর্তিগুলি পাহাড়ের গায়ে অঙ্কিত হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

রাণী কমলাদেবীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কমলাসাগরের পূর্বতীরে যে মন্দির আছে, তা কসবা কালীবাড়ি নামে অভিহিত। সে মন্দিরের পাশে দশভূজা দুর্গার পাষান মূর্তি স্থাপিত আছে। এই মূর্তিটি মহারাজা কল্যাণ মাণিক্য প্রতিষ্ঠা করেন। মূর্তির পায়ে শিবলিঙ্গ খোদিত থাকায় তা কালীদেবী নামে অভিহিত হয়।

বিলোনীয়ার অন্তর্গত পিলাক পাথর নামক স্থানে দেবারু নামে একটি অষ্টভূজা দুর্গা মূর্তির উল্লেখ আছে। সমরেন্দ্র দেববর্মণের 'ত্রিপুরা স্মৃতি গ্রন্থে।' অধুনা প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানে পিলাকে যে প্রস্তর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে মহিষাসুরমর্দ্দিনীর মূর্তি আছে। উপরে উল্লেখিত উদাহরণ থেকে সহজেই অনুমেয় যে খুব প্রাচীনকাল থেকেই ত্রিপুরায় দুর্গা পূজার প্রচলন ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকাল থেকে পরবর্তী সময়কাল পর্যন্ত ত্রিপুরায় দুর্গা পূজার যে চিত্র জানতে পারি সেটা হল ঐসময় পূজায় আগরতলা শহর আনন্দে মগ্ন থাকতো। পূজার সময় ত্রিপুরার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হত। সে সময় ত্রিপুরার নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র ও অন্যান্য বাদ্য যন্ত্রের সুমধুর স্বরে দুর্গা বাড়ির মন্দিরের প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠত। পার্শ্ববর্তী ব্রিটিশ এলাকা থেকে হাজার হাজার লোক স্বাধীন ত্রিপুরায় বিশেষ করে রাজবাড়ীর পূজা দেখতে আসতেন। রাজবাড়ির দুর্গা মণ্ডপে যে মূর্তি পূজা করা হত তা আজও স্বমহিমায় দণ্ডায়মান, যার বিশেষত হল দেবী দুর্গার দশ হাতের পরিবর্তে দু'হাত এবং বাকী আট হাত কাঠামোর পেছন দিকে দেবীর সাথে সংলগ্ন। এর পেছনে ঐতিহাসিক কী সত্য আছে আজও তা বলা যায়নি। যদিও সেটা গবেষণার বিষয়। তবে কিংবদন্তী হিসাবে যতটুকু জানা যায়, তাতে আমরা জানতে পারি যে আগরতলায় রাজধানী থাকাকালীন মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের প্রধান মহিষী মহারাণী সুদক্ষিণা দেবী দুর্গোৎসব উপলক্ষে যখন সন্ধ্যা আরতি করছিলেন, তখন জগন্মাতা বরাভয় রূপিনী দানব দলনীয় অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিতা দশভূজার মূর্তি দেখে ভয় পান। এই ভয় থেকে মহারাণী অসুস্থ হয়ে পড়েন। পর বৎসর দুর্গা পূজার পূর্বেই মহারাণী পণ্ডিত সমাজের শরণাপন্ন হন। পণ্ডিতগণ বিধান দেন দেবীকে দ্বিহস্তরূপে প্রস্তুত করে বন্দনা করতে কোনো বাধা নেই। আবার কোনো কোনো পণ্ডিত দেবীর প্রসারিত হস্তের বগলের নীচে কব্জিযুক্ত হাত দিলে দশ হাত করে পূজা করতেও বললেন এবং তাদের মতই রাজা কৃষ্ণ কিশোর গ্রহণ করলেন।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজা কৃষ্ণ কিশোরের কাল থেকে অদ্যবধি সে নিয়ম চলে আসছে। কিংবদন্তীকে ভর করে থাকলেও রাজবাড়ির দুর্গা পূজা দশ হাতের বদলে দু'হাত যুক্ত দুর্গা প্রতিমা পূজিত হয়ে আসছে। কারণ হিসাবে আমাদের মনে হয় সহজ সরল পাহাড়ি বংশের রাণীর হয়ত ত্রিপুর রাজবংশে এলে প্রথম দুর্গা প্রতিমা দেখতে যেন ভয় না পান। দুর্গোৎসব পূর্বে অধিকাংশ পাহাড়ি অঞ্চলে প্রচলিত ছিল না। হঠাৎ দশ হাত দেখে ভয় পাওয়ার সঙ্গত কারণ থাকা বিচিত্র নয়। এর পেছনে এছাড়া কোন ধর্মীয় কারণ আছে বলে মনে হয়না। দুর্গাদেবীর দশ হাতের রহস্যটা এখানেই। রাণী মহিয়সী (মহারাণী) সুদক্ষিণা দেবীর (কৃষ্ণ কিশোরের স্ত্রী) এই ভয়ের কারণেই শুধুমাত্র রাজবাড়ীর দুর্গা প্রতিমা দশহাতের বদলে দু'হাত যুক্ত করা হয়েছে, যা আজও প্রচলিত আছে। তবে বিভিন্ন পণ্ডিতদের পরামর্শে দু'হাতের বদলে চার হাত যুক্ত দুর্গা প্রতিমার পূজাও হচ্ছে ইদানীংকালে। কালের প্রবাহে এসব কিংবদন্তীগুলি মানুষ ভুলে গেলেও এ ঘটনা যে সত্যি তার সাক্ষ্য কিন্তু ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস প্রচলিত রাজমালায় লিপিবদ্ধ আছে। সবাই অবাক বিস্ময়ে এ রহস্যের কথা বললেও প্রকৃত কারণ সম্পর্কে অনেকেই অবহিত নন। এই দুর্গা বাড়ির দুর্গা পূজার এই কৌতুহল সমন্ধীয় রহস্য পাঠকদের দরবারে তুলে ধরলাম। দুর্গা পূজার বারোয়ারি আয়োজনে মা দশভূজা দশ হাতে পূজিত হলেও দুর্গা বাড়ির দুর্গা পূজা কিন্তু প্রথমে দু'হাত এবং সবশেষে কালের প্রবাহে ইদানিংকালে মতান্তরের ভিত্তিতে এবং পণ্ডিতগণের পরামর্শে চার হাতে যুক্ত মা দেবী দুর্গা এক কাঠামো মূর্তিতে পূজিত হয়ে আসছেন যা সর্বজনবিদীত।

তথ্যসূত্র ঃ রাজমালা ও স্বর্গীয় রমা প্রসাদ দত্তের পুঁথি।

কামিনী রায় : এক নারীবাদী লেখিকা

মিঠুন রায়

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাহি কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"
(আলো ও ছায়া / কামিনী রায়)

সবার হৃদয়ে গাঁথা এই অপূর্ব ও অসামান্য পংক্তিমালার রচয়িতা কবি কামিনী রায়। তাঁর কাব্য সুষমা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে চির উজ্জ্বল। কামিনী রায় মানে একজন প্রথিতযশা বাঙালি মহিলা কবি, সমাজকর্মী এবং নারীবাদী লেখিকা। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে প্রথম মহিলা স্নাতক ডিগ্রিধারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। উনিশ শতকের শেষ দিকে প্রতিষ্ঠিত বাংলার মহিলা কবিদের মধ্যে কবি কামিনী রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

কবি কামিনী রায় ১৮৬৪ সালের ১২ অক্টোবর বরিশাল জেলার বাখরগঞ্জের অন্তর্গত বাসণ্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা চণ্ডীচরণ সেন একজন ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন। একজন ঐতিহাসিক লেখক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর বোন যামিনী সেন লেডি ডাক্তার হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বাবার নিকটই কামিনী রায়ের প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হয়। চণ্ডীচরণ সেন একজন খ্যাতনামা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ১৮৮০ সালে তিনি বেথুন কলেজ থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৬ সালে এই কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বিএ পাশ করেন।

একসময় ইলবার্ট বিল আন্দোলনের জেরে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেফতার হলে কামিনী রায় বেথুন স্কুলের ছাত্রীদের সংঘবদ্ধ করার উদ্যোগ নেন।

মায়ের নিকট ছোটবেলায় কামিনী বর্ণমালা শিক্ষা পান। আট বছর বয়সে প্রথম কবিতা লেখা শুরু করেন। ঐসব কবিতায় জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ- বেদনার সহজ সরল চিত্র ফুটে উঠেছে। ১৮৮৯ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছিলেন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'কবিতাগুলি আজকালের ছাঁচে ঢালা'।

১৮৮৬ সালে তিনি বেথুন কলেজের স্কুল বিভাগে শিক্ষিকা পদে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি ঐ কলেজে অধ্যাপনা করেন। কবি কামিনী রায়ের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অনেকটা বস্তুনিষ্ঠ। অনেকটা উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন তিনি। তাই তো তাঁর লেখনী থেকে ভেসে উঠেছে সেই মনোভাব —

"পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন সকলি দাও
এর মতো সুখ কোথাও কি আছে
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"

কবি কামিনী রায়ের লেখা প্রধানত বস্তুনিষ্ঠ হলেও সবসময় নৈর্ব্যক্তিক নয়। প্রকৃতিগত ও সমাজ নির্দিষ্ট নানারকম বিধিনিষেধের ডোরে বাঁধা নারী হৃদয়ের বাণী কামিনী রায়ের কবিতায় শোনা যায়। প্রেমের হতাশা ও অনুশোচনার কথা তাঁর কবিতায় বারবার ধ্বনিত হয়েছে। তিনি তো ভারতীয় নারী। তাই তাঁর আশা জাগে —

" হয় হোক প্রিয়তম/ অনন্ত জীবন মম/ অন্ধকারময়/
তোমার পথের 'পরে / অনন্তকালের তরে / আলো যদি রয়।"

স্কুলজীবনে কামিনী রায়ের মধ্যে নেতৃত্বদানের স্পৃহা ছিল। সাহিত্যিক সরলা দেবী চৌধুরাণী তাঁর স্মৃতি চারণায় বলেছেন— '...এদিকে স্কুলে উপর ক্লাসের কতকগুলি মেয়েদের নেতৃত্ব-প্রভাবে আমার জাতীয়তার ভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হতে লাগলো। তাঁদের মধ্যে অন্যতম নেত্রী ছিলেন কামিনী দিদি ও অবলা দিদি— কবি কামিনী রায় ও লেডি অবলা বসু।'

কামিনী রায়ের কবিপ্রকৃতি ক্লাসিকপন্থী ছিল। তিনি ছিলেন নম্র, অত্যন্ত সংবেদনশীল কবি। নারীদের আত্মজাগরণ ঘটানোর ক্ষেত্রে তাঁর কবিতার বিরাট অবদান রয়েছে। কবি হেমচন্দ্রের গুণমুগ্ধ পাঠিকা রূপেই কামিনী রায়ের কাব্যপাঠে অভিনিবেশ হয়। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন — 'রবীন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্বে হেমচন্দ্র বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁহার জ্বলন্ত স্বদেশ-প্রীতি, নারী জাতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাপূর্ণ অকপট সহানুভূতি, দেশাচারের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার, জাতীয় পরাধীনতায় ক্লেশ ও লজ্জাবোধ— এ সকল তাঁর মত তেজস্বিতা ও সহৃদয়তার সহিত তাঁহার রচনার মধ্যে অনেক ত্রুটি পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমরা সকলে কলাকুশলতা হইতে কবির উচ্ছাসিত হৃদয় দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম।'

তৎকালীন সময়ে নারীদের উপর নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা ছিল, তা সত্য, কিন্তু তা উপেক্ষা করে বহু মহিলা পত্র-পত্রিকায় নানা বিষয়ে কলম ধরেছেন। নারীদের যথেষ্ট মেধা ছিল, কিন্তু তা প্রকাশ করার মত অনুকূল পরিবেশ ছিলনা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও শামিল হয়েছিলেন। বিদেশী পণ্য বর্জনের পাশাপাশি সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করে মহিলারা স্বদেশী পণ্যের পক্ষে প্রচার চালান। ঐসময় কামিনী রায়, মানকুমারী বসুর মতো কবিগণ বহু দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করেন, এ মর্মে কামিনী রায়ের রচিত কবিতার কয়েকটি পংক্তিমালা —

"যেইদিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেইদিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর
দুঃখিনী জনম ভূমি— মা আমার, মা আমার।"

কামিনী রায় বরাবরই নারীবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর অনেক প্রবন্ধেও এ ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়ে সিভিলিয়ান কেদার নাথ রায় তাঁকে বিয়ে করেন। চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ কবি কামিনী রায়ের অন্যতম প্রেম বিষয়ক কবিতা। এ কবিতার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পংক্তিমালা —

"প্রায় সে আত্মার চেতন
জীবনের জনম নুতন
মরণের মরণ সেথায়।
চন্দ্রাপীড়, ঘুমা'ও না আর—
কানে প্রাণে কে কহিল তার
আঁখি মেলি চন্দ্রাপীড় চায়।"

গার্হস্থ্য জীবনের প্রেম - প্রণয় নিয়ে লিখেছেন সুন্দর কবিতা। অপর একটি প্রেম কবিতার কিছু অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে—

"প্রণয়?
ছি!
ভালোবাসা - প্রেম?
তাও নয়।
সে কি তবে?
দিও নাম, দিই পরিচয় —
আসক্তিবিহীন শুদ্ধ ঘন অনুরাগ
আনন্দ সে নাহি তাতে পৃথিবীর দাগ।"

মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীক দুটি কবিতা অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি রচনা করেন। কলকাতার একটি বালিকা বিদ্যালয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কামিনী রায় বলেন — নারী শিক্ষার লক্ষ্য ছিল তাদের সর্বাত্মক বিকাশ এবং তাদের সম্ভাবনার পরিপূর্ণতায় অবদান রাখা।

জ্ঞান বৃক্ষের ফল শিরোনামে একটি বাংলা প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন— 'পুরুষের শাসন করার আকাঙ্ক্ষাই নারীর মুক্তির ব্যাপারে অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ। কেন? সেই একই পুরনো ভয়— পাছে তারা আমাদের মতো হয়ে যায়।'

১৯২১ সালে কামিনী রায়, কুমুদিনী মিত্র এবং মৃণালিনী সেনের সাথে নারীদের ভোটাধিকারের জন্য লড়াই করতে একটি সংগঠন তৈরী করেন। ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদ মহিলাদের সীমিত ভোটাধিকার প্রদান করে, যার ফলে ১৯২৬ সালে ভারতীয় সাধারণ নির্বাচনে প্রথমবারের মতো বাঙালি মহিলারা তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হন।

সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর দীপ্ত পদচারণা ছিল। তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে নারীদের আত্মজাগরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সংস্কৃত সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে তাঁর রচনাকর্ম ছিল পুরোপুরি মৌলিক ও নিজস্ব ঘরানার। ১৯০৯ সালে কামিনী রায়ের স্বামীর মৃত্যু হয়। সেই শোক ও দুঃখ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে— যা তাঁর কবিতায় প্রকাশ পায়। ঐ সময় লেখা বিষাদ কবিতার বেশিরভাগই সৃষ্টি হওয়ার প্রেক্ষাপট ছিল কোনো শোক বিধুর, সান্ধ্য-উপত্যকা। কামিনী রায়ের হাতে এসব বিষাদ কবিতা অপূর্ব রূপে ও কাব্য প্রসাধনে সেজে উঠেছে। এর একটি নমুনা—

"একে একে একে হায়! দিনগুলি চলে যায়,
কালের প্রবাহ 'পরে প্রবাহ গড়ায়,
সাগরে বুদবুদ মত উন্মত্ত বাসনা যত
হৃদয়ের আশা ক্ষত হৃদয়ে মিলায়
আর দিন চলে যায়
জীবনে আঁধার করি, কৃতান্ত সে লয় হরি
প্রাণাধিক প্রিয়জনে, কে নিবারে তায়?"

উনিশ শতকের শেষ দশক মহিলা কবি রচিত তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতার ঐশ্বর্য যুগ। স্বভাবতই এই তত্ত্বাশ্রয়ী মনন প্রধান কবিতা রচনায় যেসব মহিলা কবি মুন্সিয়ানা দেখিয়েছিলেন— তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কামিনী রায়।

১৩৩৮ সালের গোড়া থেকেই রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবের প্রস্তুতি চলতে থাকে। ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জয়ন্তী বিষয়ে পরামর্শ সভার অধিবেশন আহ্বান করা হল। চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জগদীশ চন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, বিধান চন্দ্র রায় ও কামিনী রায়। ১৬ মে প্রস্তুতি কমিটির সভায় রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি হন জগদীশ চন্দ্র বসু এবং সহ-সভাপতি পদে ছিলেন শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিধান চন্দ্র রায় ও কামিনী রায়। ১১ পৌষ টাউন হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হল। সভাপতি জগদীশ চন্দ্র বসু অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত ছিলেন। সেইদিনের সভায় শরৎ চন্দ্র রচিত অভিনন্দন বাণীটি পাঠ করেছিলেন কবি কামিনী রায়।

কামিনী রায় ছোটদের জন্য অনেক গ্রন্থ লিখেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দীপ ও ধূপ', 'মাল্য ও নির্মাল্য', 'পৌরাণিকী' ইত্যাদি। শিশুদের জন্য তাঁর লেখা অন্যতম জনপ্রিয় কবিতা 'কত ভালোবাসি'। কবিতার কয়েকটি পংক্তিমালা এরকম—

" জড়ায়ে মায়ের গলা শিশু কহে আমি—
মা, তোমারে কত ভালোবাসি
কত ভালোবাস ধন? জননী শুধায়
এ-ত বলি দুই হাত প্রসারি দেখায়।"

এই সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে যারা লোকলজ্জার ভয়ে কোনো প্রতিবাদ করতে চায় না অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তাঁদের কটাক্ষ করে কামিনী রায় লিখেছেন —

"করিতে পারি না কাজ সদা ভয় সদা লাজ
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

....

বিধাতা দেছেন প্রাণ
থাকি সদা ম্রিয়মান
শক্তি মরে ভীতির কবলে
পাছে লোকে কিছু বলে।"

জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেও তিনি সমাজের জন্য, দেশের জন্য কাজ করে গেছেন। নিজের ব্যক্তিগত দুঃখের চেয়েও পরাধীনতার দুঃখ তাঁর নিকট বড়ো ছিল। তাইতো কামিনী রায় 'মা আমার' কবিতায় লিখেছেন —

"সেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন
হাসি-অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর
দুঃখিনী জন্মভূমি— মা আমার, মা আমার।

....

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে
নাহিলে বিষাদময় এ জীবন কে বা ধরে।"

সাহিত্যচর্চা, অধ্যাপনার পাশাপাশি কামিনী রায় অন্যান্য দায়িত্বও পালন করেছেন। ১৯২২-২৩ সাল পর্যন্ত তিনি মহিলা শ্রম তদন্ত কমিশনের সদস্য ছিলেন। ১৯৩০ সালে বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হন। ১৯৩২-৩৩ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি বরাবরই অন্যদের সাহিত্যচর্চার জন্য উৎসাহ দিতেন। ১৯২৩ সালে বরিশাল সফরকালে কবি সুফিয়া কামালকে লেখালেখিতে মনোনিবেশ করতে বলেছিলেন।

সাহিত্যচর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কামিনী রায়কে জগত্তারিণী পদক প্রদান করা হয়। তাছাড়া তিনি বেশ কিছু পুরস্কার লাভ করেছেন। তাঁর কবিতায় বেশ কিছু নতুন নতুন শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন— দিবালোকে, জীবন-মরণ, একইমতন, মুক্তবন্দী— অর্থাৎ পরপর বিপরীত শব্দ দ্বারা বাক্য গঠন, যা কবিতায় ভিন্নতা এনে দিয়েছে। শেষ জীবন কাটিয়েছেন হাজারিবাগে।

১৯৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর বিহারের হাজারিবাগে কবি কামিনী রায়ের মৃত্যু হয়। তাঁর রচনাবলী বর্তমান সময়ে অত্যন্ত প্রয়োজন।

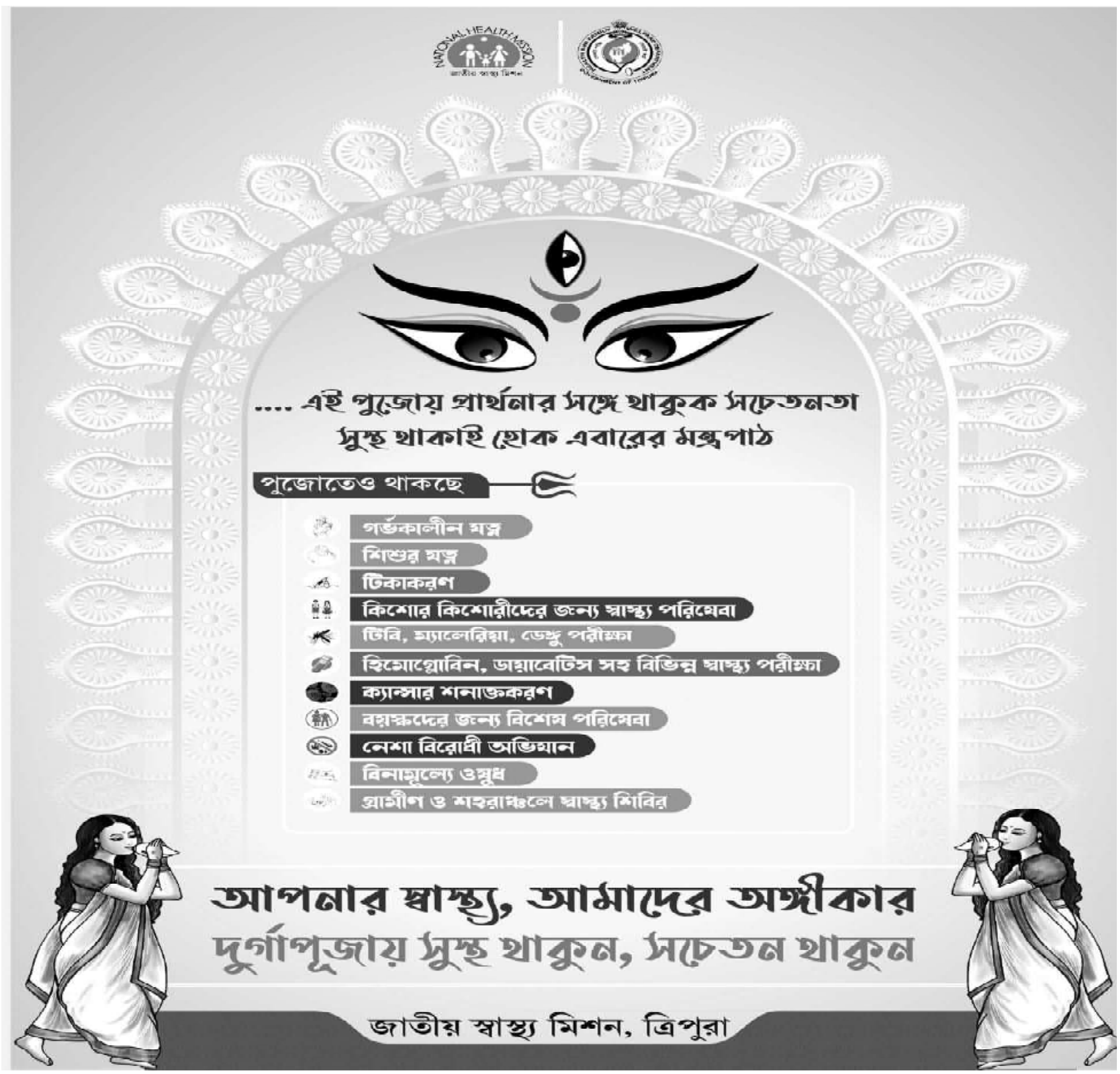

GOVERNMENT OF TRIPURA
TRIBAL WELFARE DEPARTMENT

EMPOWERING TRIBAL COMMUNITIES AND TRANSFORMING LIVES

Tribal Welfare Department has been implementing several schemes for the social and economic development of the tribal communities. These schemes focus on various aspects, including education, healthcare, economic empowerment, infrastructure development, and social welfare, to uplift tribal population and improve their standard of living. Below are the key schemes being implemented for the welfare of tribal communities in Tripura:

EDUCATION DEVELOPMENT

- **Boarding House Stipend**
- **Pre-Matric Scholarship (Class-VI to VIII)**
- **Merit Award to Meritorious Students**
- **Coaching to Madhyamik failed drop-out students**
- **Coaching and Allied Schemes**
- **Special Coaching in Core Subjects**
- **Supply of Free Text Books to ST Students**
- **Grants to Ashram Schools and Residential Schools**
- **One Time Financial Support (OTFS) for Job oriented courses**
- **Supplementary Education for Elementary Classes (SEEC)**
- **Supply of furniture to ST Hostels**
- **Augmentation of IT infrastructure for ST Hostels**
- **Pre-Matric Scholarship (Class: IX-X)**
- **Post-Matric Scholarship**
- **Eklavya Model Residential School (EMRS)**

ECONOMIC DEVELOPMENT

- **Soft loan to ST youths from ST Corporation for self-employed economic activities viz. small business, transport business, hotel business, piggery, goatery etc.**
- **Jhum Chas Sahajya Prakalpa**
- **Chief Minister's Rubber Mission**
- **Financial Assistance to ST Beneficiaries for Income Generation Activities/ running of small business etc.**
- **Mukhyamantri Janjati Bikash Yojana**
- **Minor Forest Produce Operation/ Pradhan Mantri Van Dhan Yojana**
- **Special Economic Development Package for Development of Tribals of Tripura NLFT (SD)**

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

- **Pradhan Mantri Aadi Adarsh Gram Yojana (PMAAGY)**
- **Grants under Article 275(1)**
- **Dharti Aaba Janajatiya Gram Utkarsh Abhiyan (DA-JGUA)**
- **Construction of Hostels and Tribal Rest House.**

CULTURAL DEVELOPMENT

- **Promotion of Folk Arts and Culture**
- **Celebration of Janajatiya Gaurav Divas**
- **State Level Folk Dance Competition**

EXTERNAL AIDED PROJECT

- **Tripura Rural Economic Growth and Service Delivery Project (World Bank funded).**

OTHERS

- **Chief Minister's Tribal Development Mission**
- **Nucleus Budget**
- **Bhagwan Birsa Munda Football Tournament**

STAY CONNECTED WITH US

For information on our schemes, programmes, and the latest updates, visit our website and follow us on

twd.tripura.gov.in/ | @twdtripura | www.facebook.com/twdtripura | @twdtripura

DAY-NRLM

Outreach of Tripura Rural Livelihood Mission

Women Mobilized into SHG
4.85 Lakh

Self Help Groups
54,052

Village Organization
2470

Cluster Level Federation
173

Bank Loans Provided to SHGs since 2017-18
₹1622.27 Cr.

3 Products (Risha, Pachra, and Matabari Peda) have been tagged under GI by CLFs

Livelihood
3.08 lakh
Women Members, 2592PGs

Micro Enterprises
0.38 Lakh

দিদি লাখপতি ত্রিপুরার অগ্রগতি

স্ব সহায়ক দলে যোগদান করে অসংখ্য গ্রামীণ মহিলারা খুঁজে পেয়েছেন জীবিকার উপায় এবং উন্নত হয়েছে তাঁদের জীবনযাত্রা।

Tripura Rural Livelihood Mission (TRLM)

Rural Development Department, Govt. of Tripura
IEI Building, 2nd Floor, P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala
Contact: 0381 297 6146, E-mail: ceotrlm@gmail.com

https://trlm.tripura.gov.in/ TripuraRuralLivelihoodMission @TripuraSRLM @trlm-sanjog9739
Tripura Rural Livelihood Mission TRLM Tales TRIPURA RURAL LIVELIHOOD MISSION

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ

পার্বতী দাশগুপ্তা

শিরোনামে যে গল্পটির নাম লেখা আছে তার লেখিকা আমি নই, লেখিকা আরেকজন। একার হানা ক্যাথেরিন মালেন্স-র কথায় আমি। উনার বাবা ছিলেন একজন স্টেট প্রটেসটান্ট মিশনারী, বিলেত থেকে চুঁচুড়ায় এসেছিলেন খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করতে। হানার জন্ম হয়েছিল কলকাতায়, ১৮২৬ সালে, বড় হয়েছিলেন ভবানীপুরে। ছোট থেকেই বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ছোট থেকেই আয়া এবং বাড়ির অন্যান্য কর্মচারীদের কাছে তিনি বাংলা ভাষা শেখেন। হানা ক্যাথেরিন একজন সুইস নারী ছিলেন, যিনি প্রথম বাংলা ভাষায় উপন্যাস রচনা করেন। তিনি একজন শিক্ষিকা, অনুবাদক ও লেখিকা ছিলেন। তিনি মেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে অতি উৎসাহী ছিলেন। হানা মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করেছিলেন।

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৮৫২ সালে। একটি খ্রীস্টান পরিবারের ঘটনা উপন্যাসটিতে তুলে ধরা হয়। হানা খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত দু'টি বাঙালি পরিবারের দুই মহিলার ছবি এঁকেছেন এই গ্রন্থে। এদের মধ্যে একজন ফুলমণি ও আরেকজন করুণা। এই দুইজন বাঙালি মহিলা খ্রিস্ট ধর্মান্তরিত ছিল। ফুলমণি ছিলেন গোছানো স্বভাবের মেয়ে, পরিশ্রমী ও ধর্মানুরাগী। তার স্বামী একজন সাহেবের কাছে অল্প বেতনে চাকরী করতেন। আর করুণা ছিলেন ফুলমণির বান্ধবী। একই গ্রামে বসবাস করতেন। করুণা গরীব ঘরের ছিলেন। স্বামী ছিল মদ্যপ প্রকৃতির। প্রায়শই মারধর করত। উক্ত উপন্যাসটিতে খ্রিস্টান ধর্মীয় বিশ্বাস ও খ্রিস্টান জীবনধারার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। ফুলমণি খুবই ভক্তিমতি ও খ্রিস্ট ধর্মের সকল উপদেশ মেনে চলতেন। কিন্তু করুণা তার বিপরীত ছিলেন। যদিও পরবর্তীতে তিনি খ্রিস্ট ধর্মের রীতিনীতিতে নিজেকে সমর্পিত করেন। উপন্যাসটি সহজ সরল কথ্য বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছিল। উপন্যাসটির মূল উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্ট ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার।

আমরা জানি প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' -কে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলা হয়ে থাকে, যেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৭ সালে। কিন্তু খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে লেখা এই বইটিকে বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস ধরে নেওয়া হয়, যেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫২ সালে। এটি লেখিকা হানা ক্যাথেরিন মালেন্সের একটি প্রচেষ্টা, যা খ্রিস্ট ধর্মান্তরিত বাঙালি নারীর জন্য তৈরি করেন।

‘এই ভিড়ের মাঝে’

শান্তনু রায় বর্মণ

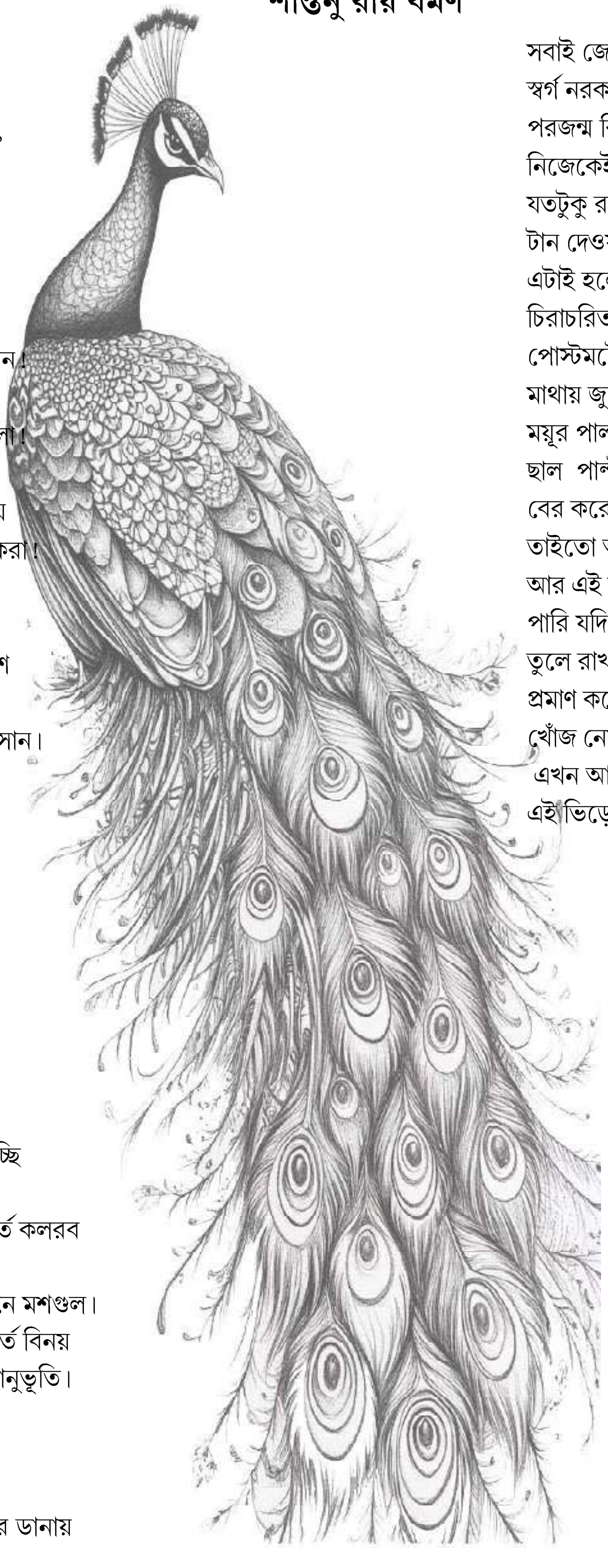

এখন নিজেকে চেনা যাচ্ছে না
এই ভিড়ের মাঝে,
সব সময় মনে একটা রোগ উঁকি দেয়,
নিজেকে প্রস্তুত রাখো —
সাফল্যের সব উপকরণে!
এরই নাম কেদারদুরস্ত।
ভালোবাসা এখন বিরল রোগ
দেহের নাচুনি এখন আইকনরোল—
না হলে তোমার অবস্থান শ্যাওলাজমিন!
ঘরে থাকুক জিরো বাল্ব
মনেতে থাকতে হবে কিন্তু লেড আলো!
জীবন শেখায় এখন এই বন্য নামতা।
বিশুদ্ধ গরুর দুধে- চায়ে ঠোঁট লাগিয়ে
কাঠের বেঞ্চে বসে প্রশংসা যাবে না করা!
দামি পোশাকে দুইশত টাকার বিলে
চায়ের কাপে চুমুতে,
শায়েরিনামাতে হবে তোমার চারপাশে
তাহলে বোধহয় মিলে যাবে
তোমার অনেক দিনের সংকল্পের অবসান।
এখন নিজেকে চেনা যাচ্ছে না
এই ভিড়ের মাঝে,
সবাই জেনে গেছে সোশ্যাল মিডিয়াতে
স্বর্গ নরক এখানেই!
পরজন্ম কিছু নেই বলে—
নিজেকেই সাজাতে হবে
যতটুকু রবারের মতো কিছু করার
টান দেওয়া বাঁক
এটাই হলো বীজ মন্ত্র!
চিরাচরিত শব্দকে দিতে যদি পারি
পোস্টমর্টেম আকারে !
মাথায় জুটে যাবে আগামী সকালের বাহুবলী সঞ্জীবনী।
ময়ূর পালক থাকুক না ম্যাজিক ব্যাগে!
ছাল পাল্টানো সময় ওই ব্যাগ থেকে—
বের করে দেব উপহার রূপে।
তাইতো আর পরজন্ম আসবে না
আর এই শরীরে !
পারি যদি বকের পাখায় গুঁজে দেব
তুলে রাখা ময়ূরের পালক,
প্রমাণ করে দেবো বিরল পাখির
খোঁজ নেয়নি আমি বাদে!
এখন আর নিজেকে চেনা যাচ্ছে না
এই ভিড়ের মাঝে।

সময়ের পদাবলী

গোবিন্দ ধর

চারদিকে খুব জমাট অন্ধকার।
মায়ের মমতা হারিয়ে গেছে।
বাবার স্নেহ ভালোবাসা উধাও।
এমন অনাকাঙ্ক্ষিত সময় পেরিয়ে যাচ্ছি
এই শতাব্দীর মানুষ।
পাশে পড়ে থাকা আহত মানুষের আর্ত কলরব
কেউ শুনে না এখন।
আমরা এতটাই আধুনিক শরীর প্রদর্শনে মশগুল।
অথচ চাপা পড়ে আছে সময় তার আর্ত বিনয়
আমাদের বিবেকে এসে খেলে না সহানুভূতি।
সময় চলছে লাইফ সাপোর্ট দিয়ে।

কেউ কারো নয় আমাদের খাই খাই
আরো আরো আত্মকেন্দ্রিক প্রজাপতির ডানায়
লেগেছে ভোর যাকে সকাল বলতে ভয় হয়।

স্মৃতি

শ্রেষ্ঠা দত্ত বণিক

আজ আমি এক অচেনা ছায়া
হয়তো কোনদিন মুছে যাব
এই অন্ধকার জগতে,
সঙ্গী বলতে আত্মা আমার
যে ছিল আমার সঙ্গে।
হে পৃথিবী ভুলো না আমায়,
করে দিও একটি বাড়ি সবার প্রাণে।
মিত্র তুমি থাকো সুখে,
প্রয়োজনে করো যেন আমায় মনে
ধরা দেব হাজারও স্মৃতি নিয়ে।
দোহাই পরমেশ্বর—
জগতের এই আনন্দে
আমায় নির্ধারণের
যোগ্য করতে।।

মহা কুম্ভ

ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী

ওই যে দেখো কত সাধু আজ
দিচ্ছে হাতছানি,
ডাকিছে আমায় আয় আয়।
সকল দেবতা আজ সাধু রূপে,
মর্তে করেছেন মর্তে অবতরণ।
ভাবি আমি কত পুণ্যের ফলে,
আজ সাক্ষী এ পুণ্য ক্ষণের।
তুমি যাকে বল নেংটো (নাগা) সাধু,
জানো কি তার ইতিহাস।
যদি না থাকত তারা,
আজ কত না রাম হত রহমান।
কত না সীতা হত সামিনা।
কিন্তু হে হিন্দু আজ বলতে বড়ো লাগে লাজ
ভিনদেশীর লোক আজ দিচ্ছে পায়চারী
বুঝতে সনাতনের স্বাদ।
কিন্তু তুমি হে সনাতনী,
এখন দিচ্ছ ডুব ওই গির্জার হলি ওয়াটারে।
আর ভিনদেশী আজ বলছে বল
আর গাইছে গান হর হর মহাদেবের।
মহা কুম্ভ আজ দিচ্ছে ডাক,
পুরাণ সনাতনের।

স্নিগ্ধ সুবাস

শাশ্বতী দেব

শরতের স্নিগ্ধ আকাশ
শুভ্রতায় থাকে ঘেরা,
কুয়াশার শ্বেতশ্রী বিন্দুতে
ঘাস থাকে আচ্ছন্ন
মেঘলা আকাশে শুধু শরতের
আগমন বার্তা,
কাশবনে দোল খায় কাশফুল
মৃদুমন্দ হাওয়ায়।
শুভ্র কাশফুলের আন্দোলনে
আন্দোলিত হয় আকাশ -বাতাস
শরতের পেঁজা তুলোয়।

সেই অদ্ভুত প্রশ্ন

সুস্মিতা দেবনাথ

সকালটা ছিল অন্যান্য দিনের মতই।

গত কিছু দিন ধরেই প্রচন্ড ঠান্ডা।

নীলিকেশ বরাবরই মতই সবার আগে আজও অফিসে এসে আপন মনে কাজ করে চলেছেন।

একা, একদমই একা নীলিকেশ।

জীবনযুদ্ধে অনেক কিছু জিতেও কোথাও যেন এক নিঃসঙ্গতা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। শহরের আলো, কেরিয়ার, সাফল্য সবই আছে, কিন্তু পাশে কেউ নেই। নিজেই কফিজগ থেকে এক কাফ কফি ঢেলে কাচের দেওয়ালের বাইরের চলমান ব্যস্ত শহরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হঠাৎ দরজায় টোকা। দরজার দিকে না তাকিয়েই বললেন—

'কাম ইন।'

রোজি ঢুকল।

রোজি, পুরো নাম রোজিতান্যা মুখার্জি। বয়স প্রায় ছাব্বিশ। চোখে-মুখে সাহস আর স্বচ্ছতার রেখা, অথচ চেহারার ভিতরে এক অদ্ভুত সংযম। অফিসে সবাই তাকে একটু দূরে থেকে দেখে, কারণ সে সহজে মিশে না, কাজ ছাড়া কথা বলে না। কিন্তু যাকে বিশ্বাস করে, তার জন্য পৃথিবীর যেকোনো দেয়াল ভেঙে ফেলতে পারে।

শান্তভাবে ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে বলল—

— স্যার, কি ভাবছেন?

— কই তেমন কিছু না তো।

— আপনি খুব একা তাই না স্যার?

— দিন শেষে সবাই একা, আর সারাদিন তো তোমাদের সাথেই কেটে যায়।

— স্যার একটা ব্যক্তিগত কথা বলি?

নীলিকেশ অবাক হয়ে তাকালেন। রোজি সাধারণত অত্যন্ত সংযত, সংক্ষিপ্ত কথায় কাজ সারে। বললেন—

হ্যাঁ, বলো।

রোজি কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে বসার অনুমতি চাইল।

আপনি কিছু মনে করবেন না তো আমার কথায়?

— না, কেন মনে করবো, তুমি নিশ্চিন্তে বলো

— স্যার, আপনি কেন বিয়ে করছেন না?

— আবার বিয়ে? এই বয়সে?

— স্যার আমার মা'কে বিয়ে করবেন?

প্রশ্নটা যেন ঘরের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণকেও আরও শীতল করে দিল। নীলিকেশ চমকে তাকালেন।

— তুমি কী বললে?

— আমি খুব সিরিয়াসলি বলছি, আপনি আমার মা'কে বিয়ে করবেন?

— কি সব বলছো তুমি? তোমার মাথা খারাপ হলো নাকি?

— হ্যাঁ, আমি আমার মায়ের কথাই বলছি।

— মেয়ে হয়ে মায়ের বিয়ের কথা বলছি।

নীলিকেশ চমকে উঠল, চোখ সরিয়ে নিতে চাইল, কিন্তু কণ্ঠস্বরটা ছিল দৃঢ় ও মোলায়েম।

— কি সব বলছো? মাথা খারাপ হলো নাকি তোমার? তোমার মাকে আমি কোন্ দুঃখে বিয়ে করতে যাবো শুনি?

মেয়েটি হাসল।

— দুঃখে নয় আনন্দে করবেন। কারণ আমার মায়ের মত মানুষ আপনি সারা জীবনেও খুঁজে পাবেন না।

নীলিকেশ বললেন— তোমার মা নিশ্চয়ই ভালো মানুষ, কিন্তু এমন প্রস্তাব তুমি আমায় কেন দিচ্ছ? আর কেনই বা আমি একজন এত বড় মেয়ের ডিভোর্সি মাকে বিয়ে করব? তোমার কি মনে হয় এটা স্বাভাবিক প্রশ্ন?

রোজি থামল না। তার চোখে তখন অদ্ভুত শান্ত অথচ দৃঢ় এক দৃষ্টি।

— স্যার, আমার মা ডিভোর্সি ঠিক, আপনিও কিন্তু স্ত্রীহারা। তাই এটা মুখ্য কারণ হতে পারে না। আপনি বড় একা, মানুষ একা থাকতে পারে না।। আপনি বাইরে কঠোর, কিন্তু ভেতরে শিশুর মত কোমল।

— আরে তুমি তো দেখছি আমার কেস স্টাডি ভালোই জানো।

— স্যার আপনার সাথে এতদিন ধরে কাজ করছি,আপনার সম্পর্কে অনেকটা জানা হয়ে গেল।

—এত কিছু জানার কারণ?

— ওই যে বললাম আমার মা। বড়ই একা। আপনারা দু'জনই জীবনের অনেকটা দিয়ে দিয়েছেন, এখন শুধু একটু ভালোবাসা আর সহচর দরকার। আপনি যদি একটিবার কথা বলতেন, বুঝতেন মা'র ভিতর কী রকম আশ্চর্য আলো আছে।

নীলিকেশ থমকে গেলেন। এই মেয়ে এত কম সময়ে এত গভীর কথা কীভাবে বলল!

— আচ্ছা, একদিন কথা বলবো।

— নাম্বারটা দিয়ে যাই স্যার?

—আচ্ছা দিয়ে যাও। তবে কথা দিচ্ছি না, কথা বলতে তো আপত্তি নেই।

রোজি এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দেয়।

— আপনি যদি একবার মায়ের সঙ্গে গল্প করেন, দেখবেন জীবনের ক্লান্তি যেন হালকা হয়ে আসে।

নীলিকেশ কিছু বললেন না, শুধু জানালার দিকে তাকিয়ে রইলেন। দূরে কোথাও দীপশ্রী'র মুখটা হঠাৎ ভেসে উঠল।

নীলিকেশের প্রথম প্রেম দীপশ্রী।

কলেজের দিনগুলোয় দুপুর বেলা ক্যাম্পাসের মেহগনি গাছের নিচে বসে দু'জনে গল্প করত। দীপশ্রী বলত—

— তুমি খুব বেশি চুপচাপ, আমি বুঝি না, এত ভাবো কী?

নীলিকেশ হেসে বলত—

— তুমি তো বলেই ফেলো সব, আমি শুধু শুনে নিই।

ওদের প্রেমটা ছিল ধীরে গড়া, কিছুটা অভিমান, কিছুটা ভালোবাসায় মিশে থাকা। দু'জনেই লেখাপড়া শেষ করে সংসার শুরু করেছিল। কিন্তু দীপশ্রী স্বপ্ন দেখত বিদেশে পড়ার, গবেষণার। একদিন গবেষণার কাজে ছুটে যায় বিদেশে। আর ফিরে আসেনি দীপশ্রী। বছর তিনেক পরে সে জানায় এখন অন্য কারো সঙ্গে আছে, ভালো আছে।

আর একবার নীলিকেশের হৃদয়ে মৃত্যু নামে। এরপর ছোট্ট সময়ের জন্য এসেছিল অর্পিতা। স্তব্ধ, সংবেদনশীল, তবু জীবনের প্রতি গভীর মমতাবান এক নারী। অর্পিতা তাকে স্বস্তি দিতে চেয়েছিল। তারা বিয়ে করেছিল, কিন্তু মাত্র দুই বছর পর এক দুর্ঘটনায় অর্পিতাকে হারায় নীলিকেশ। সেই থেকে সে একা, নিজের তৈরি কঠিন শেল এর ভেতরে।

সেদিন সন্ধ্যায় রোজি হঠাৎ ফোন করে।

— স্যার, নিশ্চয় একা আছেন? একটু কথা বলুন আমার মার সাথে।

নীলিকেশ কিছু বলেনি, রোজি ফোনটা এগিয়ে দেয় তার মার কাছে।

নীলিকেশ হ্যালো বলতেই অপর পাশ থেকে একটা শান্ত গলায় উত্তর আসে—

— নমস্কার স্যার, আমি রূপা। আপনার কথা রোজির কাছে অনেক শুনলাম। আর বলবেন না স্যার, আমার মেয়েটা বড়ই পাগল, বড়ই ভালোবাসে আমাকে। সারাদিন তো আপনার সাথেই থাকে। রাতে এসেও আপনার কথা সবসময় তার মুখে।

এই ভাবেই প্রথম কথা শেষ হল রূপা আর নীলিকেশের।

রূপা মুখার্জি, মধ্যবয়সী এক নারী। সাবেক স্কুল শিক্ষিকা। তার চোখেমুখে এখনো এক অমোঘ মাধুর্য। রোজির বাবা বহু আগেই চলে গেছে অন্য নারীর টানে। রূপা লড়েছেন, মেয়েকে মানুষ করেছেন, নিজের স্বপ্ন চাপা দিয়েছেন।

রোজি দেখেছে, মা গভীর রাতে বই নিয়ে বসে থাকে, বা ছাদে একা দাঁড়িয়ে আকাশ দেখে। তীব্র এক শূন্যতা তাকে ঘিরে রাখে।

এক রাতে, মায়ের ঘরে আলো জ্বলছে দেখে দরজায় দাঁড়ায় রোজি।

— মা, তুমি এখনো জাগো?

রূপা জানালার বাইরে তাকিয়ে বলল

— আকাশটা আজ কী অদ্ভুত লাগছে না রোজি? আমি কত বছর ধরে এই আকাশ দেখি, জানো?

রোজি হঠাৎ মায়ের চোখে এক ভীষণ আলো দেখে বলে

— তুমি একা থাকো, তবু হাসো। কেন?

রূপা শুধু বলেছিল

— কেউ পাশে না থাকলেও বাঁচতে হয় মা।

সেই রাতেই রোজির মনে একটা সিদ্ধান্ত পাকা হয়। তার মা আর একা থাকুক, সে চায় না। আর সে জানে, স্যার নীলিকেশ মানুষের বিচার করেন গভীরতা দিয়ে, বাইরের আবরণ দিয়ে নয়।

সেদিন বিকেলে অফিস শেষে নীলিকেশ ফোন করলেন রূপাকে। প্রথমে কিছুটা আনুষ্ঠানিক, তারপর ধীরে ধীরে কথার মধ্যে কিছু নরমতা আসে।

— রোজি ভীষণ মিষ্টি মেয়ে, জানেন রোজি আমাকে কি প্রস্তাব দিয়েছে?

— কি প্রস্তাব?

— আপনাকে বিয়ে করার প্রস্তাব।

রূপা একটু অবাক, তারপর হেসে বলল—

— রোজি বড়ই পাগলামি করে। কিছু মনে করবেন না,ও যে কি শুরু করলো, আর কি-ই বা মাথায় চড়ল বলুন, এইসব হয় নাকি? আপনি এইসব নিয়ে একদমই ভাববেন না, আমি আসলে ওকে বুঝিয়ে বলব।

— না,না ওকে কিছু বলতে যাবেন না। তবে রোজির প্রস্তবটা হয়।

দিন কেটে যায়, কথার পর কথা। একদিন নীলিকেশ রূপাকে অফিসের পাশের এক ক্যাফেতে আসার আমন্ত্রণ জানায়। এতদিনে নীলিকেশ তার জীবনের সব কথাই প্রায় শেয়ার করে নিয়েছে রূপার কাছে।

সেদিন রূপা বলেছিল—

— আপনি কি এখনও দীপশ্রী বা অর্পিতার কথা ভাবেন?

নীলিকেশ চমকে উঠেছিল, তারপর বলেছিল—

— না, ভাবি না। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আর কোনো গল্পের পাতায় আমার নাম লেখা হবে না।

রূপা হাত বাড়িয়ে বলেছিল—

— তাহলে চলুন, নতুন এক অধ্যায় লিখি।

নীলিকেশ প্রথমবার তার হাতে হাত রাখে। এবার আর কাঁপে না হাতটা।

অফিসে রোজি ভীষণ খুশি, সারাসময় এটা ওটা নিয়ে নীলিকেশের কেবিনে চলে আসে। নীলিকেশও রোজির সাথে আরো আপন হয়ে ওঠে।

প্রায়ই মার হাতের এটাওটা রান্না নিয়ে আসে রোজি নীলিকেশের জন্য। দু'জনে মিলে একসাথে লাঞ্চ করে গল্প করতে। আজ বক্স নিয়ে ঢুকতেই নীলিকেশ বলল—

— তোমার মা আজ কী রান্না করেছে ?

রোজি মুচকি হেসে বলল—

— আপনার প্রিয় কড়াইশুঁটির তরকারি, আর রুটি, সাথে আর একটা তরকারিও দিয়েছে, রাজমার ডাল।

— আরে বাহ্! আজ তো দারুণ জমবে আমাদের লাঞ্চ।

— একটা কথা বলি, আপনাকে আমি কবে থেকে বাবা বলে ডাকব?

— পাগল মেয়ে।

— যেদিন থেকে আমি অফিসে এসে জয়েন করেছি, সেদিন থেকেই আপনাকে আমি বাবার ফিগার ভেবেছি।

নীলিকেশ চেয়ার ছেড়ে রোজিকে জড়িয়ে ধরে, আয় মা এই বাবার বুকে।

বৈদ্যুতিন বর্জ্যের দ্বারা পরিবেশ দূষণ

প্রণয় কুমার রায় বর্মণ

জীবনে সমস্যা অনিবার্য, আর সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার আরেক নাম জীবন। সমস্যাটা যদি আর্থিক, পারিবারিক বা সামাজিক সমস্যা হতো তাহলে নিশ্চয়ই কোনো সমাধানের পথ বের করা যেত। কিন্তু সমস্যাটা যদি হয় সুস্থ পরিবেশ রেখে যাওয়ার— সত্যি ভাবতে বসলে সব কেমন যেন ওলটপালট হয়ে যায়। যদি প্রশ্ন করা হয়, এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশী কে বিপদগ্রস্ত বা সংকটাপন্ন ? ভাবনা চিন্তা না করেই যে কেউ বলতে পারবে সে হল আমাদের পরিবেশ অর্থাৎ যার মধ্যে আমরা বাস করছি।

সভ্যতার শুরু থেকেই বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার আমাদের জীবনকে করে তুলেছে সাবলীল ও স্বাচ্ছন্দ্যময়। কিন্তু সেই সৃষ্টি সুখের উল্লাসে আমরা এমন কিছু ভুলভ্রান্তি করে বসেছি যার ফলে বিশ্ব পরিবেশ ক্রমশ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে। পরিকল্পনাবিহীন ক্রমবর্ধমান শিল্পের অগ্রগতির ফলে রাসায়নিক এবং ইলেকট্রনিক্স বর্জ্য পদার্থ বিশ্ব পরিবেশকে এমনভাবে দূষিত করছে যা ভাবলে ভয় হয়। চিন্তা করলে শিহরণ জাগে। সভ্যতার যতই অগ্রগতি ঘটেছে প্রযুক্তি-বিজ্ঞান ততই সরল থেকে জটিল ও জটিলতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত প্রযুক্তি বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছিল শুধুমাত্র যন্ত্র উপহার। আধুনিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এই যন্ত্রদানবকেই কেন্দ্র করে। শিল্প বিপ্লবের পরে দেশে দেশে হাতের কাজের স্থান গ্রহণ করেছে যন্ত্র— আর তা দান করেছে মানুষকে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের ক্ষমতা। সে যন্ত্র ছিল মানুষের গুরুভার কাজের সঙ্গী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রযুক্তি বিজ্ঞান একলাফে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এখন আমরা বাস করছি ইলেকট্রনিক্সের চরম উন্নত প্রযুক্তি বিজ্ঞান কম্পিউটারের যুগে। বিরাট কম্পিউটার বিপ্লব ইতিমধ্যেই আমাদের জীবনে প্রবল আঘাত হেনেছে। অতীতের আগুন আবিষ্কার, শিল্প বিপ্লব, সমস্ত কিছুর প্রভাব ইতিমধ্যেই ম্লান হয়ে গেছে আধুনিক ইলেকট্রনিক্স কেন্দ্রিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের প্রবল সংঘাতে। বৈদ্যুতিন শিল্পের প্রসারের সঙ্গেই ভারতে দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে বৈদ্যুতিন বর্জ্য বা ২০২৮ সালের মধ্যে যে বর্জ্যের পরিমান দাঁড়াবে আনুমানিক ৩০ লক্ষ টন ৩০০ কোটি মিলিগ্রাম, রাষ্ট্রপুঞ্জের সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে বাতিল মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, টিভি সেটের মতো নানাবিধ ইলেকট্রনিক বর্জ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সদ্য প্রকাশিত এই রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৬ সালে গোটা বিশ্বের সম্মিলিত বৈদ্যুতিন বর্জ্যের পরিমাণ ছিল ৪৪.৭ মিলিয়ন টন। এরমধ্যে শুধু ভারতেই জড়ো হওয়া ইলেকট্রনিক বর্জ্য ২০ লক্ষ মিলিয়ন টন। অর্থাৎ ২০০ কোটি

কিলোগ্রাম। বৈদ্যুতিন শিল্পের প্রসারের পাশাপাশি বৈদ্যুতিক সামগ্রী আমদানীর কারণেও বেড়ে চলেছে এই Electronic Waste এর পরিমাণ। রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্বেগের কারণ হল, সঠিক পদ্ধতিতে এই সমস্ত ইলেকট্রনিক বর্জ্য ধ্বংস করা হচ্ছে না। ফলে এইসব ইলেকট্রনিক পণ্যে থাকা লেড, ক্যাডামিয়াম, ব্রোমিনেটেড শিখা,পলি ক্লোরিনেটেড বাই ফিনাইল পরিবেশ দূষণ ছড়াচ্ছে। শ্বাসের মাধ্যমে শরীরে ঢুকে মারাত্মক ক্ষতিও করে চলেছে। ASSOCHAMKPMC এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী মোট বৈদ্যুতিন বর্জ্যের ৭০ শতাংশই জড়ো হচ্ছে বিভিন্ন শিল্প-কারখানা থেকে। বাড়িঘর থেকে আসছে ১৫ শতাংশ বর্জ্য।

ভারতের ইলেকট্রনিক বর্জ্যের একটা বড় অংশই হল বাতিল মোবাইল ও নানা টেলিকম সামগ্রী। মোট বৈদ্যুতিন বর্জ্যের ১২ শতাংশই এরা দখল করে আছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, ২০১৬ তেই ভারতে বৈদ্যুতিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি পাশ হয়েছে। কিন্তু সে অর্থে জনমানসে এখনও ইলেকট্রনিক বর্জ্য নিয়ে সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। ইলেকট্রনিক বর্জ্য বা ই-বর্জ্য অর্থাৎ Electronic Waste বলতে পরিত্যক্ত বৈদ্যুতিক বা ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম বা পরিত্যক্ত যন্ত্রপাতি বোঝায়। এগুলি মূলত ভোক্তার বাসাবাড়িতে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি যেমন — ফ্রিজ, ক্যামেরা, মাইক্রোওয়েভ, ওয়াশিং মেশিন,টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ইলেকট্রনিক বর্জ্যের নিয়মনীতিহীন, ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াকরণ থেকে মানব স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে এবং পরিবেশ দূষণ হতে পারে। কম্পিউটারের সিপিইউ বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রাংশটির মতো কিছুকিছু ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাংশ সীসা, ক্যাডামিয়াম, বেরিলিয়াম, ক্রোমিয়াম ইত্যাদির মতো ক্ষতিকর পদার্থ থাকা সম্ভব।

উন্নয়নশীল দেশের ইলেকট্রনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জড়িত শ্রমিক সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি অনেক বেশি। এ সমস্ত বর্জ্য পুনঃচক্রায়ন প্রক্রিয়াতে শ্রমিকেরা ভারী ধাতুর সংস্পর্শে যেন না আসে, সে ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান হওয়া উচিত। ২০১৪ সালে জাপানে অবস্থিত জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় 'The Global Electronic Waste Monitor 2014. Quantities flows and Resources' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যাতে বলা হয় যে বিশ্বে প্রতিবছর ৪ কোটি টনেরও বেশী ইলেকট্রনিক বর্জ্য উৎপাদিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গণচীন এই দুইটি দেশ সারা বিশ্বের ইলেকট্রনিক বর্জ্যের এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদন করে। এইসব ইলেকট্রনিক বর্জ্যে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ধাতু ও অন্যান্য অনেক উপাদান আছে। যেগুলি পুনঃচক্রায়ন করা সম্ভব। যদিও লোহা, তামা, সোনা, রূপা, অ্যালুমিনিয়াম, প্যালভিয়ামও পুণর্ব্যবহারযোগ্য অন্যান্য উপাদানগুলির মোট মূল্য ৫২০০ কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি। বাংলাদেশে গত ২১ বছরে মোবাইল ফোন থেকে ১০,৫০৪ মেট্রিক টন বিষাক্ত ইলেকট্রনিক বর্জ্য উৎপন্ন হয়েছে। Consumer Electronics বা Home Electronics বলতে ব্যক্তিগত বাসাবাড়িতে প্রাত্যহিক কাজে ব্যবহৃত অ্যানালগ বা ডিজিটাল ইলেকট্রনিক যন্ত্রসমূহকে বোঝায়। এ ধরনের যন্ত্রগুলি বিনোদন যেমন, সমতল পর্দার টেলিভিশন বা এল এ ডি টিভি, ডিভিডি প্লেয়ার, ভিডিও গেম,দূর নিয়ন্ত্রিত খেলনা গাড়ি ইত্যাদি। যোগাযোগের মাধ্যমের জন্য ব্যবহৃত টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ ইত্যাদি এবং বাসাবাড়িভিত্তিক কার্যালয়ের কাজ যেমন ডেস্কটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার, কাগজ কাটার যন্ত্র ইত্যাদি এসব কাজে ব্যবহৃত হয়।

এইসব যন্ত্রপাতিগুলির যখন সময়সীমা অতিক্রম হয়ে যায় অর্থাৎ দীর্ঘদিনের পুরোনো হয়ে একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, তখন এইগুলি ফেলে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। পরিবেশে এরা জঞ্জাল রূপে অর্থাৎ ইলেকট্রনিক বর্জ্য রূপে পরিগণিত হয়। ২০১০ এর দশকে এসে ভোক্তা, ইলেকট্রনিক্সের বিভিন্ন যন্ত্র ডিজিটাল প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে উৎপাদন করা হচ্ছে। এই নতুন ধারাটিকে তথ্য-প্রযুক্তির ভোক্তায়ন বলে অভিহিত করা হচ্ছে। ভোক্তা ইলেকট্রনিক দ্রব্যগুলির একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলির দাম সময়ের সাথে সাথে ক্রমাগতভাবে হ্রাস পায়। এগুলিতে ব্যবহৃত অর্ধপরিবাহী মাইক্রো প্রসেসরগুলির উৎপাদন খরচ গবেষক মুরের সূত্র অনুযায়ী দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন ব্যবস্থা কম খরচে বিদেশী শ্রমের ব্যবহার ইত্যাদিও এগুলির মূল্যহ্রাসের অন্যতম কারণ। আজকাল এইসব যন্ত্রগুলির বেশিরভাগই ওয়াইফাই, ব্লুটুথ বা অন্য প্রযুক্তিব্যবহার করে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হতে পারে।

এই ইলেকট্রনিক দ্রব্যগুলি বাস্তব বিশ্বে অবস্থিত দোকানের পাশাপাশি ইন্টারনেটেও বেচাকেনা করা হচ্ছে। ভোক্তা ইলেকট্রনিক দ্রব্যের বিক্রি জ্যামিতিক হারে বেড়ে গেছে বলে এগুলি যখন ব্যবহার শেষে পরিত্যক্ত হয়,তখন প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর এ জাতীয় ইলেকট্রনিক বর্জ্যের নেতিবাচক প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বর্জ্য থেকে শুরু হলো নতুন ব্যবসায়িক দিক। ভারতবর্ষের তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্রপ্রদেশে বিকল হয়ে যাওয়া এই ইলেকট্রনিক বর্জ্য নামে অভিহিত যন্ত্রগুলি সমুদ্রের তীরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। আর এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা ফেলে দেওয়া ইলেকট্রনিক যন্ত্রগুলি তুলে এনে পুনঃচক্রায়ন বা Re-cycling পদ্ধতিতে আবার ব্যবহারযোগ্য করে তুলছে। পুনরায় বাজারজাত করে এইসব ব্যবসায়ীগণ ন্যূনতম দামে বিক্রি করে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এতে এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা লাভবান হচ্ছে।

ভারতবর্ষের কয়েকটি বাজারে পুনঃচক্রায়ন বা Re-cycling কোম্পানী হল- Eco Re-Cycling Company, Zolopik Re-Cycling Company, Binbag Re-Cycling Company, Karma Re-Cycling Company, Namo Electronic Waste Re-Cycling Company। প্রতিবছর ১৪ই অক্টোবর দিবসটি বিশ্ব ইলেকট্রনিক বর্জ্য দিবস হিসেবে সারা বিশ্বে পালন করা হচ্ছে। এই ইলেকট্রনিক বর্জ্যের পুনঃচক্রায়ন প্রক্রিয়াতে এর পুনরায় ব্যবহার করার উপরও জোড় দেওয়া। এতে এ জাতীয় ইলেকট্রনিক বর্জ্যের নেতিবাচক প্রভাবও পরিবেশের উপর কম হবে। ২০১৮ সালে WEEE FORUM এর দ্বারা এই ১৪ই অক্টোবর থেকে বিশ্ব ইলেকট্রনিক বর্জ্য দিবস সারা বিশ্বে প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এই দিবস পালনের তাৎপর্য হল পরিবেশে ইলেকট্রনিক বর্জ্য দূষণ কমানো।

OBC Welfare Department

AT A GLANCE

Sl	Name of Scheme	Eligibility Criteria
	Educational Development	
1	**Pre Matric Scholarship. (50:50) Stipend :- Rs. 100/- per month for 10 months.**	i. OBC Students of Class I to X. ii. OBC Certificate. iii. Income:- Rs. 2.50 lakh per annum.
2	**Post Matric Scholarship. (100% Central Share). As per approved rate of different courses varying from Rs.1600 to Rs. 4.00 lakh. a. Class XI- Rs 1600/- per annum. b. Class XII- Rs 1600/- per annum. C. Govt Degree College;- Rs. 2100 per annum. d. Other Courses:- As per approved rate considering tuition fee and maintenance allowance.**	i. OBC students pursuing studies from Class XI onwards. ii. OBC Certificate. iii. Income:- Rs. 2.50 lakh per annum. iv. Applied through NSP 2.0 Portal.
3	**One time financial support for economically weaker meritorious OBC Student.**	i. OBC Certificate. ii. Marks:- 50% and above. iii. Income:- Rs. 2.50 lakh per annum iv. The applicant must apply in NSP 2.0 portal for Post-Matric Scholarship. v. This is applicable only for professional Courses in addition to Post-Matric Scholarship vi. Students for 200 number per year for 2 years @ Rs. 50,000/- per year against approved Courses.
4	**Dr. B.R. Ambedkar Gold Medal Award.**	i. OBC Students securing 1st to 10th position in Madhayamik and H.S (+2 Stage) Examination under TBSE. ii. Special Award:- Rs. 25000/- iii. Gold Medal with Certificate.
5	**Dr. B.R. Ambedkar Merit Award.**	i. OBC Students securing 60% marks in Madhyamik and HS (+2Stage) examination under different recognized boards. ii. Award money:- Rs. 1500/- with certificate.
Sl	**Name of Scheme**	**Eligibility Criteria**
	Social Sector	
6	**Financial Assistance to poor OBC patient under Nucleus Budget Scheme.**	i.OBC Certificate ii. Aadhar Card iii.Bank Account iv.Income:- Rs. 1.20 lakh V.BPL Ration Card vi. Patient covered under Ayushman Bharat Scheme is not eligible. vii. Power to Sanction:- a. SDM:- Rs. 1500/- b. DM:- Rs. 2000/- C. Director:- Rs. 6000/- d. Secretary:- Rs. 9000/- e. Minister:- Rs. 15000/-
7	**Vidya Sagar Socio Cultural Award.**	i. Eminent Personalities from OBC who contributes substantially towards development of Socio-Cultural Section, Literature, fold, sports etc are honored with this Award. ii. Award Money:-Rs. 10,000/- iii. Number:-3 persons per year. iv. Selection done by OBC Commission

অন্ধত্ব মানেই অন্ধকার নয়

প্রেরণা প্রণব লাল

পঞ্চানন মণ্ডল

দৃষ্টিশক্তি নেই, অথচ তিনি এক বড় ফটোগ্রাফার! না, আপনার পড়ার ভুল নয় প্রণব লাল সত্যিই এমন এক মানুষ, যিনি জন্মগতভাবে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন হয়েও ক্যামেরায় বন্দি করেছেন রঙিন পৃথিবীর নানান দৃশ্য। দিল্লির এই তরুণ পেশায় সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ, কিন্তু বর্তমানে বেশি পরিচিত মূলত তাঁর ফটোগ্রাফির জন্য।

প্রণবের জন্ম হয়েছিল অকাল রেটিনোপ্যাথি নিয়ে। ফলে তিনি কখনও এই রঙিন পৃথিবীর সৌন্দর্য্য দেখতে পাননি। অনেক দৃষ্টিহীন মানুষের মতো তা ছিল এক চূড়ান্ত সীমাবদ্ধতা। পরিচিত সবাই ভেবেছিলেন, ও হয়তো কখনও স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম করতে পারবে না।

আর ফটোগ্রাফি? সে তো সম্পূর্ণ চিন্তার বাইরে।

কিন্তু অসম্ভব শব্দটি প্রণবের অভিধানে নেই। কিশোর বয়সে তিনি পরিচিত হন একটি অনন্য সফটওয়্যারের সঙ্গে vOICe। নেদারল্যান্ডসে তৈরি এই প্রযুক্তি ক্যামেরার মাধ্যমে পাওয়া ছবি শব্দে রূপান্তর করে। ছবির প্রতিটি রেখা, উচ্চতা, উজ্জ্বলতা আলাদা আলাদা সুরে বাজতে থাকে। প্রথমে সেই 'শব্দের দুনিয়া' ছিল বিভ্রান্তিকর, প্রায় অচেনা এক গোলকধাঁধা। কিন্তু প্রণব হাল ছাড়েননি। বছরের পর বছর অনুশীলন করে তিনি শিখে নিলেন কীভাবে শব্দকে দৃশ্যে রূপান্তরিত করতে হয়।

ধীরে ধীরে তিনি বুঝতে শুরু করলেন দেয়াল কোথায়, দরজা কেমন, গাছ বা মানুষের অবয়ব কী রকম। সেই বোঝাপড়া দিয়েই তিনি ধরলেন ক্যামেরা। শুধু ছবি তোলাই নয়, ফ্রেমিং, আলো এবং দৃষ্টিকোণ বেছে নেওয়ার মতো সূক্ষ্ম কাজগুলোও করতে শুরু করলেন।

তাঁর চারপাশের মানুষ প্রথমে বিশ্বাসই করতে চায়নি। কেউ ভেবেছে অন্য কেউ নাকি তাঁর হয়ে ছবি তোলে, কেউ আবার একে নিছক কৌশল বলে খাটো করেছে। কিন্তু প্রণব প্রমাণ করেছেন, শিল্প সৃষ্টির জন্য চোখ নয়, প্রয়োজন অন্তর্দৃষ্টি যা শুধু ইন্দ্রিয় দিয়ে নয় আসতে পারে কল্পনা দিয়ে, শিল্প বোধ দিয়ে।

তিনি ভ্রমণ করেছেন নানা দেশে। পাহাড়, সমুদ্র, ঐতিহাসিক নিদর্শন সবই ধরা দিয়েছে তাঁর ক্যামেরায়। এমনকি আইসল্যান্ডের নর্দার্ন লাইটসের মতো বিস্ময়কর দৃশ্যও তিনি শব্দের মাধ্যমে 'দেখে' ধারণ করেছেন। তাঁর বিশ্ব ভ্রমণ অবশ্য সহজ ছিল না; বিমানবন্দর বা নতুন শহরে চলাফেরা করতে তাঁকে ভরসা রাখতে হয়েছে শব্দের সংকেত আর প্রযুক্তির ওপর। তবুও তিনি পিছপা হননি।

আজ প্রণব লাল কেবল এক দৃষ্টিহীন বিশেষভাবে সক্ষম ফটোগ্রাফার নন, বরং এক প্রতিভাবান শিল্পী, যিনি প্রমাণ করেছেন অন্ধত্ব মানেই জীবন অন্ধকার নয়। দৃষ্টিশক্তি হারালেও মানুষ তার সৃজনশীলতা, কল্পনা আর প্রযুক্তির সাহায্যে নতুনভাবে পৃথিবীকে দেখতে পারে।

তাঁর এই জীবন উত্থান আসলে অন্ধত্বের বিরুদ্ধে লড়াই নয়, বরং সেই সমাজের বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধ, যারা বলে 'তুমি পারবে না।' আর প্রণব তাঁর প্রতিটি ছবির মাধ্যমে জানিয়ে দেন— 'হ্যাঁ, আমি পারি, আমরাও পারি।'

দৃষ্টিহীন ফটোগ্রাফার প্রণব লালের তোলা ছবি

বেনানা প্রব্লেম

বিষ্ণু ঠাকুর

কাজের চাপও দিন দিন বেড়ে চলেছে। আগে পাঁচটা বাজার আগেই সবাই টেবিল ফর্সা করে নিতো। ফাইলপত্তর গুছিয়ে সাইড করে নিতো। পেন্ডিং থাকলে হরির নামে পরদিনের জন্য রেখে গল্প শুরু করতো। মাঝেমাঝেই হাত ঘড়িটার দিকে তাকাতো। বড় কাঁটা বারোর ঘরে ঢুকতেই ঘর খালি। কেউ কেউ মিটিং মিছিলের নাম করে অনেক আগেই কেটে পড়তো। টিফিনের নাম করে দুপুরে বাড়িতে গেলে সাড়ে তিনটের আগে টেবিলে লোক দেখা যেতো না। মিটিং থাকলে তো আর আসবেই না। আসতেই হবে না। সেসব দিন কাগে খেয়েছে। মণিষদা মাঝে মাঝেই একটা নিঃশ্বাস ফেলে। টিফিন এখন অফিসেই সেরে নেয় মণিষদা। জাস্ট এক ঘন্টার ব্র্যাক। যে যার টেবিলে বসেই যা কিছু খেয়ে নিল। তারপরই আবার কাজে হাত। স্পাই ঘুরছে। সি সি ক্যামেরায় সব উঠে যাচ্ছে। নয়া অধিকর্তা। তাঁর আবার এ দেশী ভাষাটা আয়ত্ত্ব হয়নি এখনও। যা বলবেন,ইংরেজীতে। উত্তর দিতে হবে তাঁর ভাষাতেই। দু'একজন ছাড়া সবাই নিজের ভাষাতেই স্বচ্ছন্দ। মণিষদাই এই অফিসে এক মাত্র পারফেক্ট ইংরেজী অনার্সের লোক। তাই মণিষদার ছুটিও হয় রাত আটটার পর। মণিষদা ছাড়া আরও দু'জন আছেন এই অফিসে। বড়ো বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাঁরাও। ঘরের এক কোণে বসা সলিলবাবু। বদলি হয়ে এ অফিসে এসেছেন পাঁচ বছর হলো। জীবনের একুশ বছর মিছিল মিটিং করেও মফঃস্বল শহরে কাটাতে হয়েছে। বছর চারেক আগে এখানে কাজে যোগ দিয়েই হাত পা ছড়িয়ে বসেন। আগে তিনিও দুপুরে বাড়ি গেলে সাড়ে তিনটেয় ফিরতেন। বেশ ক'দিন তিনি দুপুরে বৌকে ফোনে বলেছেন, তুমি খেয়ে নাও। আমি অফিসের ক্যান্টিন থেকে রুটি মেরে দেবো। আমার অধিকর্তাও দুপুরে রুটি মারেন। আমাকেও মেরে দিতে বললেন। অফিসে এখন অনেক কাজ। রোলিং এর বিপরীত মেরুর কিছু লোক দুষ্টুমি করছে। তাদের বিরুদ্ধে গলা চড়াতে হবে। আসছে ইলেকশন। এখন থেকেই যদি গলা না চড়ানো যায়, ঠিক ঠিক আসনে বসে ঠিকঠাক কাজ করা যাবে না। তাই একশ শতাংশ হাজিরা মাস্ট। নিখিলবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই পিছু নেয় বাদল। দূরে দাঁড়িয়ে বিকাশদা সব শুনছিল। বিকাশদা আবার সব কিছুতেই নীরব। নীরবতাই তার ধর্ম। ধর্মই তার নীরবতা। নিখিলবাবু বেরিয়ে যেতেই ঘর নীরব। বিকাশদা টেবিলে বসে কম্পিউটার খুলে কী সব টাইপ করে চলেছে। নিস্তব্ধ ঘর। সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। বাদল ফের ঘরে ফেরে। হুংকার দিয়ে বলল,বিকেলে মিটিং আছে। পাঁচটার পর নট হোম। ডাইরেক্ট মিটিং। বাদলের ইংরেজী শুনে বিকাশদা এবার মুখ খোলে। কাজ করতে করতেই বাদলের দিকে তাকায়। অফিসের এই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বাদলকে পূর্ণাঙ্গ রূপে ডাকে। বলল, বাদল দুপুরে শুধু মুড়িই খাচ্ছো কেন। মুড়ির সঙ্গে খানকতক কলাও খেও।

কলার ফুড ভেল্যু কিন্তু বেশী। সলিলবাবু বলল,ইয়েস বিকাশদা। কলা আমি খাচ্ছি,খাই। আগেও খেয়েছি। এখনও খাই। সকালে তো টিফিনের

সঙ্গে খাবোই। দুপুরেও খাই। মণিষদা ঘরে ঢুকে। আলোচনায় তিনিও অংশ নেন। বলল, দেখো হে,কলা অমনই এক বস্তু, হবিষান্ন থেকে ড্যাশ ড্যাশ ড্যাশ সবেতেই অব্যর্থ। কলা দানও মহৎ দান। দিতেও পারো। নিতেও পারো। বাদল নীরবতা ভেঙে বলল, আমি কলা খাই না। সলিলবাবু বলল, না, বাদলদার কনস্টিপেশন নেই। সবসময় ডাইরেক্ট ইন। ডাইরেক্ট আউট। অতএব কলা বাদলদাকে কেউ দেবেও না। বাদলদা খাবেও না। বলেই বাদলের দিকে একগাল হেসে তাকায় সলিলবাবু। বিকাশদা এদিকে তাকায়। বিকাশদা অফিসের হেড ক্লার্ক। বিকাশদার ঠিক উপরের আসনেই মণিষদা। মণিষদা অফিসে ঢুকেই মেম এর সঙ্গে মিটিং এ বেরিয়ে যান। বিকেলে ফেরেন। রাত আটটা অব্দি অফিস করেন। তারপর বাড়ি ফেরেন। মাঝখানে খানকতক রুটি আর কলা। কলা আর রুটি। মেম এর সাজেশনে মণিষদা দুপুরে রুটি খান। মণিষদার সাজেশনে মেম রুটির পরে কলা খান। মণিষদাই অফিসের সবাইকে কলা খাওয়া শিখিয়েছেন। আকছার বলেন, দেখো, কথায় কথায় কলা কলা করো না। কলার মতো অমন বস্তু হয় না। কলা না থাকলে রাষ্ট্রই অচল হয়ে যেতো। তাই যে কোনও কাজে কলা মাস্ট। খেটে যাও। কলা হাতে বাড়ি যাও। কলা আছে, মানে শান্তি আছে। সাধে কি ভগবান নারায়ণ কলা এত ভালোবাসেন। লক্ষ্মীনারায়ণ কলাতে আছেন। কিছুক্ষণ আগে মণিষদার বৌ ফোন করলেন। মণিষদা তাঁকে বললেন 'ফিরতে দেরী হবে। চিন্তা করো না। দুপুরে রুটি কলা খেয়ে নিয়েছি। অফিস শেষে তিন মাথার মোড়ে মিটিং আছে। মিটিং সেরে আবার খানকতক কলা খেয়ে নেবো। ব্যস।'

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে যাচ্ছে। অফিসের সবাই রেডি। বাদল বিপুল বাজাবে। সবাই এল প্যাটার্ন বারান্দায় কলার মত লাইন করে দাঁড়াবে। নিখিলবাবু এগিয়ে আসবেন। বলবেন, তে-চ্চল। ব্যাস, কলা এগিয়ে চললো। খানকতক স্লোগান চলবে, কলা এগিয়ে যাবে। কলা এগিয়ে যাবে, মিটিং চলতে থাকবে। সংসারে কিছু থাকুক, না থাকুক, মিছিল আছে। থাকবে। মিটিং আছে, থাকবে। কলা আছে, থাকবে। বলো বীর, বলো উন্নত-মম শির।

জলাতঙ্করোধী টিকা নিয়েও মৃত্যু : কেন ?

সমাধান দে

কুকুর নিয়ে এখন সরগরম মিডিয়া। কুকুরদের অধিকারের প্রশ্নে সোচ্চার পশুপ্রেমীরা। আবার অনেকে কুকুর পথঘাট থেকে সরিয়ে দেয়ার পক্ষে। শেষমেশ বিষয়টি গিয়ে পৌঁছলো দেশের সর্বোচ্চ আদালতে। দিল্লির প্রেক্ষিতে মামলাটি হলেও সুপ্রিম কোর্টের দু-প্রস্থ রায় শেষে যা আদেশ হলো তা কার্যকর হবে সারা দেশেই। আদেশে বলা হয়েছে— পথকুকুররা পথেই থাকবে।

পথকুকুরদের সম্পর্কে শীর্ষ আদালত প্রথমে রায় দিয়েছিলো রাস্তা থেকে কুকুরদের তুলে নিয়ে আশ্রয় কেন্দ্রে রাখতে হবে। পরে রায় সংশোধন করে বলেছে, পথকুকুরদের ধরে নির্বীজকরণ, জীবাণুমুক্ত ও টিকাদান করার পর তাদের আগের জায়গাতেই ছেড়ে দিতে হবে। তবে জলাতঙ্ক আক্রান্ত বা আগ্রাসী কুকুরদের আলাদা আশ্রয় কেন্দ্রে রাখা হবে। এছাড়া সর্বজনীনভাবে পথকুকুরদের খাওয়ানো বন্ধ করা হবে এবং কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট ফিডিং স্পট তৈরি করবে।

এই লেখার মূল প্রতিপাদ্য সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিষয় নয়। কুকুরের কামড় থেকে হওয়া জলাতঙ্ক রোগের টিকার সহজ প্রাপ্ততা ও এই টিকার বৈজ্ঞানিকভাবে সংরক্ষণের বিষয়টিই এখানে আলোচ্য। জলাতঙ্ক রোগের টিকা সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করায় তা কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলছে এবং এর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে। পথকুকুর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আইনি লড়াই এবং এনিয়ে আদালতের রায়ের প্রসঙ্গ লেখার প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে— কারণ, টিকা নেয়ার পরও মৃত্যুর যে ঘটনাগুলো ঘটছে, তা সেভাবে আলোচনায় আসেনি। অথচ এটা একটা মারাত্মক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কুকুর কামড় বা আঁচড় দিতেই পারে। এর থেকে জলাতঙ্ক রোগ হলে এই রোগ থেকে বাঁচার টিকাও আছে। কিন্তু কিছু টিকা ব্যবসায়ী এবং সরকারি ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থার উদাসীনতায় কখনও কখনও টিকা নিয়েও জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। এই অবহেলা ক্ষমার অযোগ্য।

পথকুকুরদের সরিয়ে নেয়া ও নির্বীজকরণ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রথম রায়ের পর কুকুরপ্রেমীরা এর বিরুদ্ধে যখন পথে নেমে আন্দোলন করছিলেন, তখন এই আন্দোলনের বিরুদ্ধেও মতামত প্রকাশ করেছেন কয়েকজন। যারা বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেছেন তাদের প্রায় সবাই অভাগা অভিভাবক, যাদের সন্তান কোনো না কোনো সময় পথকুকুরদের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে। সন্তানহারা এই অভিভাবকদের কাছ থেকে জানা গেছে, কুকুর কামড় দেয়ার পর জলাতঙ্করোধী টিকা নেয়া হয়েছিলো। তারপরও তাদের প্রাণ রক্ষা হয়নি। কিন্তু কেন ?

জলাতঙ্ক বিরোধী টিকার মজুত করার পদ্ধতির মধ্যেই এর উত্তর লুকিয়ে আছে। যদিও মূল কারণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, কিছু টিকা ব্যবসায়ী ও সরকারি ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থার উদাসীনতা এর জন্য মূল দায়ী। এই টিকা সবসময় ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে রাখতে হয়। কখনোই একে ফ্রিজ করা যায় না। এছাড়া সূর্যের আলো এবং জলীয়বাষ্প থেকেও দূরে রাখতে হয়। অনেক ব্যবসায়ী অতিরিক্ত মুনাফার জন্য এই প্রোটোকল মানেন না। দোকান বন্ধ করার সময় রেফ্রিজারেটারও বন্ধ করে দেন। এছাড়া, টিকাগুলো স্থানান্তরের সময়ও নির্দেশিকা ঠিকঠাক মানা হয়না। সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোও অনেকক্ষেত্রে এই অসাধু ব্যবসায়ীদের জনস্বাস্থ্য বিরোধী এমন ভয়ঙ্কর কাজকে বন্ধ করার চেষ্টা করে না বা গাফিলতি করে।

আবার সরকারি হাসপাতালে শুধুমাত্র বি পি এল রোগীদের এই টিকা দেয়া হয়। অন্যরা বাজার থেকে টিকা কিনতে বাধ্য হন। তখনই নষ্ট হয়ে যাওয়া টিকা হাতে আসে, যা আমরা জানতেও পারিনা। সঠিকভাবে সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট টিকা কিনে আসলে আমরা মৃত্যু পরোয়ানা কিনছি। এই নষ্ট টিকাই জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্তদের মৃত্যুর কারণ।

এর সমাধান একটাই। মানুষের জীবনমরণ নিয়ে অসাধু টিকা ব্যবসায়ীদের ভয়ঙ্কর খেলার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে পথে নামতে হবে। সরকারকে বাধ্য করতে হবে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। জলাতঙ্ক বিরোধী টিকা প্রয়োজনমত সরকারকেই ব্যবস্থা করার দাবি সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে।

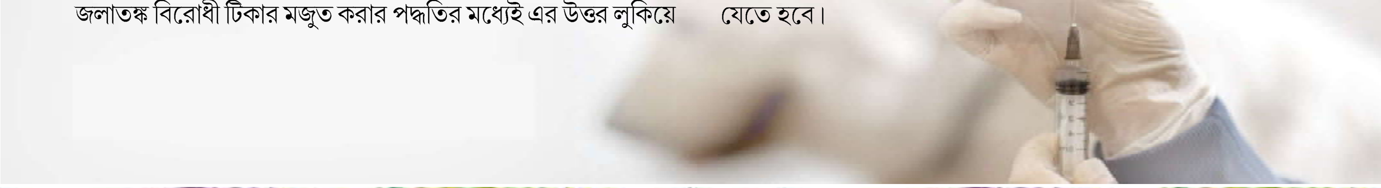

থ্যালাসেমিয়ার গল্প

ডা.কনক চৌধুরী

থ্যালাসেমিয়া একটি জেনেটিক রক্তের ব্যাধি। বিশ্বজুড়ে লাখো মানুষের জীবনকে কষ্টের মাঝে ঠেলে দেয়, তবুও জনস্বাস্থ্যের আখ্যানে এটি এখনও কম আলোচিত। যাদের রোগ নির্ণয় করা হয়েছে, তাদের দৈনন্দিন জীবন চিকিৎসা, অসহায়ত্ব এবং সামাজিক, মানসিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার চারপাশে ঘুরপাক খায়। কিন্তু এই বাধাগুলির পাশাপাশি মানবিক মুখ, বিজ্ঞানের আলো, আশা এবং স্থিতিস্থাপকতার কাহিনীও রয়েছে। এই লেখাটি তাই তাদের জন্য তৈরি করেছি যারা থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বেঁচে আছেন— যারা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে উঠেন, মানিয়ে নেন এবং সাফল্য লাভ করেন।

থ্যালাসেমিয়া একটি বংশগত রোগ যেখানে শরীর অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন তৈরি করে, যার ফলে লোহিত রক্তকণিকা অত্যধিক ধ্বংস হয়ে যায়। এর দুটি প্রধান ধরন রয়েছে: মেজর এবং বিটা থ্যালাসেমিয়া, প্রতিটির তীব্রতা ভিন্ন। সবচেয়ে সাধারণ এবং গুরুতর রূপ, থ্যালাসেমিয়া মেজর, যার জন্য প্রায়ই নিয়মিত রক্ত দেয়া এবং চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। থ্যালাসেমিয়া আজীবনের জন্য একটি রোগ হওয়া সত্ত্বেও, প্রাথমিক রোগ নির্ণয়, সঠিক চিকিৎসা সহায়তা এবং জীবনযাত্রার সমন্বয়ের মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। থ্যালাসেমিয়ার সাথে বেঁচে থাকার অর্থ হল দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি, ফ্যাকাশে ত্বক এবং দেরিতে বৃদ্ধির মতো শারীরিক লক্ষণগুলির সাথে মোকাবিলা করা। এতে করে ঘন ঘন শিশুরা স্কুলে অনুপস্থিত হয়, অন্যান্যরা কাজ হারায়। প্রায়ই হাসপাতালে যেতে হয় এবং উদ্বেগের অনুভূতির সাথে লড়াই চালিয়ে যেতে হয়। অনেক রোগী এবং তাদের পরিবার বারবার রক্ত, আয়রন চিলেশন থেরাপি এবং ওষুধের আর্থিক চাপও বহন করে। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের বাবা-মায়ের জন্য রোগ নির্ণয় অসহনীয় মনে হতে পারে। তবুও, তাদের অনেকেই অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যান, সচেতনতা বৃদ্ধি করেন এবং তাদের সন্তানদের যতটা সম্ভব স্বাভাবিক জীবনযাপন নিশ্চিত করেন। তারাই আমাদের আশার আলো। আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য নতুন আশার আলো এনে দিয়েছে। এই উদ্ভাবনগুলি কেবল জীবনের মান উন্নত করছে না— তারা অনেক রোগীর ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে দিচ্ছে।

বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট (BMT) পদ্ধতিটি যোগ্য রোগীদের ক্ষেত্রে থ্যালাসেমিয়ার একমাত্র প্রমাণিত ও পরীক্ষিত নিরাময়। একটি সফল বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট, যখন জীবনের প্রথম দিকে উপযুক্ত দাতার সাথে করা হয়, নিয়মিত রক্তদান এবং আয়রন চিলেশন থেরাপির প্রয়োজনীয়তা দূর হবার সম্ভাবনা অনেক। আরেকটি নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি হলো জিন থেরাপি। যুগান্তকারী পদ্ধতি হিসেবে এটি আমাদের মাঝে এসেছে। এর লক্ষ্য হল স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন উৎপাদনের জন্য দায়ী জিনের একটি সুস্থ অনুলিপি প্রবর্তন করে মূল জিনগত দোষ দূর করা। ক্লিনিকাল ট্রায়ালগুলি আশাব্যঞ্জক ফলাফল দেখিয়েছে, কিছু রোগীর চিকিৎসার পরে আর রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়নি। এছাড়াও যারা এখনও রক্ত সঞ্চালনের উপর নির্ভরশীল, তাদের জন্য নতুন মুখে খাওয়া চিলেশন ওষুধ আয়রনের অতিরিক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণ করা সহজ এবং অনেক কম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত। ডিফেরাসিরক্স এবং ডিফেরাপ্রোনের মতো ওষুধগুলি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলিতে আয়রন জমা হওয়ার সাথে সম্পর্কিত জটিলতা প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে।

ভারত জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় এর উপর কাজ হচ্ছে। অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স (এইমস) এবং সিএমসি ভেলোর,ফর্টিস হাসপাতালসহ ভারতীয় চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি এখন বিখ্যাত হেমাটোলজিস্টদের নির্দেশনায় অত্যাধুনিক চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে। এইসব বৈজ্ঞানিক ও সম্মিলিত অগ্রগতি এমন একটি ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেখানে থ্যালাসেমিয়া আর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নয় বরং একটি নিরাময়যোগ্য অবস্থা। মনে রাখতে হবে, থ্যালাসেমিয়ার বিরুদ্ধে কেউ একা লড়াই করে না। পারিবারিক সহায়তা, কাউন্সেলিং এবং একইরকম আরো রোগীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন (NGO)গুলো অনেক ক্ষেত্রেই রোগীদের সাহায্য করে, তাদের আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে এবং সর্বশেষ আধুনিক চিকিৎসা সম্পর্কে অবগত থাকতে সাহায্য করে। আমাদের রোটারি ক্লাব যেমনভাবে এই ব্যাপারে আপমর জনসাধারণকে সাহায্য করে।

স্কুল, কলেজ এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচার বাড়িয়ে এবং জেনেটিক স্ক্রিনিং এর ব্যাপারে প্রচার বাড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে এই অবস্থা প্রতিরোধে সাহায্য করবে। তাই, চলুন থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সম্পূর্ণ বেঁচে থাকি। থ্যালাসেমিয়া নিয়ে পুরোপুরি বেঁচে থাকার মানে হল সম্ভাব্য সবকিছুকে নতুন করে দেখা, চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও জীবনকে জড়িয়ে ধরা। নিয়মিত চিকিৎসা, সহায়ক যত্ন এবং দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে, থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা শিক্ষা, ক্যারিয়ার, সম্পর্ক এমনকি পিতামাতা হওয়ার পথেও এগিয়ে যেতে পারেন। মূল বিষয় হল এই অবস্থাটি বোঝা, চিকিৎসা পদ্ধতি মেনে চলা এবং একটি সুস্থ মানসিকতা গড়ে তোলা। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুরা নিয়মিত স্কুলে যেতে পারে যখন তাদের রক্ত ও ওষুধ এর জন্য সুব্যবস্থাপনা করা হয়। প্রাপ্তবয়স্করা ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারে এবং স্বাধীন জীবনযাপন করতে পারেন। ব্যায়াম, পুষ্টি, মানসিক সুস্থতা এবং নিয়মিত চিকিৎসা পরীক্ষা — এই সবকিছুই জীবনের মান উন্নত করতে অবদান রাখে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে, থ্যালাসেমিয়াকে স্বপ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে না— কেবল স্বপ্ন পূরণের জন্য ভিন্ন ধরনের শক্তির প্রয়োজন। থ্যালাসেমিয়ার সাথে বেঁচে থাকা সহজ নয়। এর জন্য সাহস, শৃঙ্খলা এবং আশাবাদ প্রয়োজন। কিন্তু যারা এর সাথে বেঁচে আছেন তাদের গল্পগুলি মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে। আমরা যখন গবেষণা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং চিকিৎসা সেবার সুযোগ উন্নত করার ক্ষেত্রে সহায়তা রাখছি, তখন আসুন আমরা প্রতিটি থ্যালাসেমিয়া যোদ্ধা এবং তাদের পরিবারের শক্তিকে উদ্ভাসিত করি। তাদের যাত্রা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে জীবন সবসময় সহজ নাও হতে পারে, তবুও এটি অবিশ্বাস্যভাবে অর্থবহ ও সুন্দর হতে পারে।

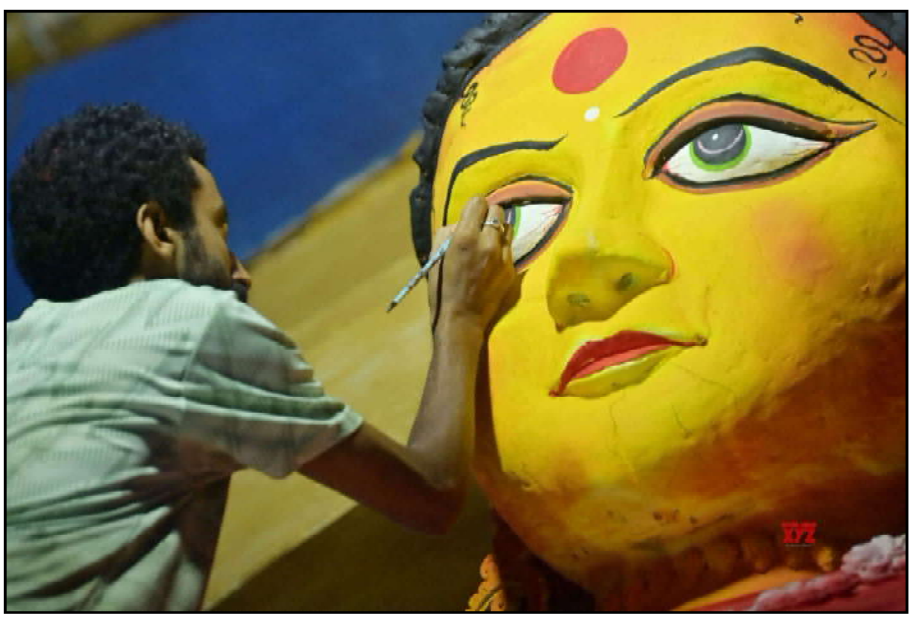

এবারকার মহালয়ায় মডার্ণ ক্লাবের মৃন্ময়ী মাকে চিন্ময়ী রূপে ফুটিয়ে তুলছেন শিল্পী রিমন সাহা।

চিকিৎসা জগতে ফিজিওথেরাপি

ডা. অনিন্দিতা দে

ফিজিও মানে শারীরিক এবং থেরাপি মানে চিকিৎসা, এই দুইটি শব্দ থেকে এসেছে ফিজিওথেরাপি। এটি একটি স্বতন্ত্র চিকিৎসা ব্যবস্থা, যেখানে শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। এই পদ্ধতির চিকিৎসকরা 'ফিজিওথেরাপিস্ট' নামে পরিচিত।

'ফিজিওথেরাপি' হচ্ছে এক ধরনের বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতি যা শরীরের বিভিন্ন সমস্যা যেমন— আঘাত, অসুস্থতা বা অক্ষমতা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে। এই চিকিৎসায় রোগী সুস্থ হয়ে কাজে ফিরে যেতে পারেন। বর্তমানে সারা বিশ্বে এই বিষয়টি এতই সমাদৃত হয়েছে যে, মানুষ ব্যথা হলে ফিজিওথেরাপিস্টের সাথে যোগাযোগ করেন।

ফিজিওথেরাপি— রোগীর শারীরিক পুনর্বাসনের জন্য শিক্ষা ও অনুপ্রেরণার পাশাপাশি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, শারীরিক ব্যায়াম, আঘাত বা অসুস্থতার কারণে গতিশীলতা রোগে আক্রান্ত রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্য জড়িত। এখানে মূলত একটি কথা জানাতে হয়, কোয়ালিফাইড ফিজিওথেরাপিস্ট হতে চাইলে কমপক্ষে সাড়ে চার বছরের কোর্স ও ছয় মাসের ইন্টার্নশিপ করে ব্যাচেলর বা স্নাতক ডিগ্রি গ্রহণ করতে হয়। শুধুমাত্র ফিজিওথেরাপি বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীকেই 'ফিজিওথেরাপিস্ট' বলা হয়ে থাকে। এরা অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, প্যাথলজি, সাইকোলজি, ফার্মাকোলজি, অর্থোপেডিক্স রিউমাটোলজি, নিউরোলজি, কার্ডিওলজিসহ আরো অনেক চিকিৎসা সম্বন্ধিত পুঁথিগত বিদ্যায় জ্ঞান রাখেন। এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে একজন রোগীকে বন্ধুসুলভ আচরণ করে পুরোপুরি সুস্থ করে তোলেন একজন কোয়ালিফাইড ফিজিওথেরাপিস্ট।

ফিজিওথেরাপি কিছু সুবিধার প্রদান করে। যেমন—

১. অর্থোপেডিক সমস্যার সমাধান করে। যেমন শরীরের হার, জয়েন্ট, পেশি, ট্যান্ডন ও লিগামেন্ট সম্পর্কিত সমস্যা যা শরীরের মাস্কলোস্কেলেটেল সিস্টেম নামে পরিচিত।

২. স্নায়বিক রোগে অর্থাৎ মস্তিষ্কের ব্যধি, মেরুদন্ড ও শরীরের স্নায়ু রোগ নিরাময়ের সাহায্য করে।

✶স্ট্রোক✶মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস ✶পারকিনসন ডিজিজ✶সেরিব্রাল পালসি ✶ ব্যাকবোন ইনজুরী ইত্যাদি

৩. কার্ডিওপালমোনারির সমস্যা যাদের শ্বাসকষ্ট ও ধৈর্য কমে যায়,

তাদের নির্দেশিত ব্যায়াম ও প্রতিরোধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনমানের উন্নতি করা হয়।

৪. থেরাপিউটিক ব্যায়ামে স্ট্রেচিং ও ট্রিগার পয়েন্ট থেরাপি যুক্ত থাকে যা কঠোরতা হ্রাস করে এবং ব্যথা উপশম করে।

৫. সেরিব্রাল পালসিতে আক্রান্ত শিশুদের জন্য ফিজিওথেরাপি স্পাস্টিসিটি ও বিকৃতি কমাতে সাহায্য করে এবং বাচ্চাদের সহায়ক যন্ত্র ব্যবহার করতে শেখায়।

৬. খেলাধূলার মাঠেও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ফিজিওরা। যখন খেলোয়াররা আঘাত পান বা ফ্র্যাকচার হয়, তখন ফিজিওথেরাপিস্টরা তাদের ব্যথা উপশম করতে সহায়ক হয়।

সর্বশেষে বলতে হয়, সারা বিশ্বে আর আমাদের সামাজিক জগতে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা পদ্ধতির বিকল্প নেই। জীবনে, যেখানে ওষুধপত্র আমাদের দৈনন্দিন চাহিদা হয়ে পড়ে, সেখানে ফিজিওথেরাপি ওষুধ ছাড়াই শারীরিক ব্যায়াম ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে দৈনন্দিনভাবে সুন্দর এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে তোলে।

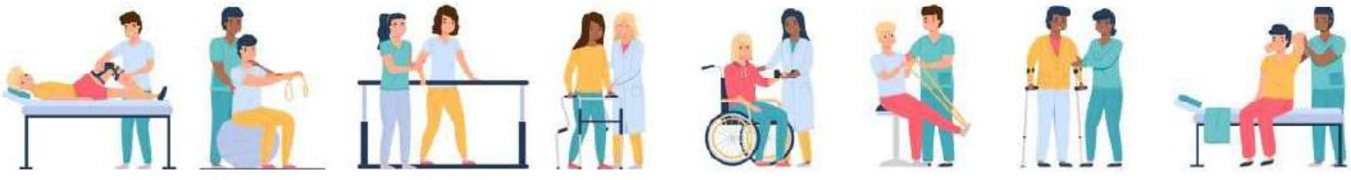

১২৮ বছর পর অলিম্পিকে ক্রিকেট

পার্থ ভট্টাচার্য

১২৮ বছরের অপেক্ষার অবসান। শেষবার ১৯০০ সালে অলিম্পিক গেমসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ক্রিকেট। অবশেষে ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ফিরছে ক্রিকেট। এই খবরে আগেই শিলমোহর দেওয়া হয়েছিল অলিম্পিক কমিটির পক্ষ থেকে। এ বার প্রকাশ্যে এল নতুন ফরম্যাট। আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ক্রিকেটের জন্য মোট ৬টি দল অংশ নেবে অলিম্পিকে। পুরুষ এবং মহিলা, উভয় ক্রিকেট টিমের কাছে থাকছে সোনা জেতার সুযোগ।

'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এ বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ক্রিকেট ফেরায় খুশি হয়েছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। আর শুধু ২০২৮ সালেই নয়, ২০৩২ সালে ব্রিসবেন অলিম্পিকেও থাকতে পারে ক্রিকেট। অলিম্পিকে একবারই মাত্র ক্রিকেট হয়েছিল। সেই ১৯০০ সালে। মাত্র দুটো টিম গ্রেট ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের একটি ম্যাচ হয়েছিল। গ্রেট ব্রিটেন সোনা জিতেছিল। পরবর্তী অলিম্পিক অর্থাৎ ২০২৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে ৬টি করে দল অংশ নেবে।

মোট ৯০ জন ক্রিকেটারের জায়গা ধার্য করা হয়েছে ২০২৮ সালের অলিম্পিকের জন্য। টেস্ট বা ওয়ান ডে নয়, টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে খেলা হবে ম্যাচগুলি। পুরুষ এবং মহিলাদের ৬টি করে দল অংশ নেবে এই প্রতিযোগিতায়। যেহেতু মোট ৯০ জন ক্রিকেটার অংশ নিতে পারবেন, তাই ১৫ সদস্যের স্কোয়াড বানাতে হবে দলগুলিকে।

তবে এখনও জানানো হয়নি কী ভাবে বেছে নেওয়া হবে এই ৬টি দলকে। ICC-র পূর্ণ সদস্য মোট ১২টি দেশ, যার মধ্যে রয়েছে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউ জিল্যান্ড, আফগানিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জিম্বাবোয়ে, আয়ারল্যান্ড। তা ছাড়াও মোট ৯৪টি দল ICC-র অ্যাসোসিয়েট দেশ হিসেবে শুধুমাত্র টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে খেলে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ICC র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থাকা প্রথম ৬টি দলকেই বেছে নেওয়া হবে। তবে আয়োজক দেশ হিসেবে সরাসরি সুযোগ পেতে পারে আমেরিকা। সে ক্ষেত্রে আর ৫টি দল সুযোগ পাবে অংশ নেওয়ার। ২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারতীয় দল। ক্রমতালিকা অনুযায়ী ধরলে ভারতের খেলা নিশ্চিত। আর সেক্ষেত্রে একটা সম্ভাবনার কথাও মনে পড়ছে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় জানিয়েছিলেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবীন্দ্র জাডেজা। অলিম্পিকে ক্রিকেট ফেরার ক্ষেত্রে ভূমিকা রয়েছে বিরাট কোহলির। তিনিও অবসরের পর জানিয়েছিলেন, ভারত যদি অলিম্পিকে পদকের ম্যাচে ওঠে, অবসর ভেঙে ফিরতে পারেন। বিরাট কোহলি কি ফিরবেন? সোনা জয়ের লক্ষ্যে বিরাট-রোহিতরা অবসর ভেঙে ফিরবেন কি না, সেদিকেই নজর ক্রিকেটপ্রেমীদের।

তবে যোগ্যতা অর্জন পর্ব নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে না পারলেও দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিল লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকের আয়োজক কমিটি। সেখানে বলা হয়েছে, ২০২৮ সালের ১২ জুলাই থেকে শুরু হবে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। অধিকাংশ দিনই দু'টি করে ম্যাচ রাখা হয়েছে। তবে ১৪ এবং ২১ জুলাই ক্রিকেট ম্যাচ হবে না। ২০ জুলাই মেয়েদের এবং ২৯ জুলাই পুরুষদের পদকজয়ের ম্যাচগুলি খেলা হবে। পোমোনার অস্থায়ী একটি মাঠে ২০২৮ সালের অলিম্পিক ক্রিকেট খেলা হবে। এই জায়গাটি লস অ্যাঞ্জেলস থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

ত্রিপুরার অরিত্র এভারেস্টের চূড়ায়

বিপ্লব চন্দ

মাউন্ট এভারেস্টে নাম উঠল ত্রিপুরার। বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গে পা রাখলেন অরিত্র রায়। এভারেস্ট জয়ের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণ হলো। গত ১৬ মার্চ আগরতলার উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে থেকেই শুরু হয়েছিল মহানযাত্রা। যাত্রাটা শুরু করেছিলেন একজন পর্বত আরোহী হিসেবে নয়। বাধারঘাটস্থিত ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের প্রয়াত শারীরশিক্ষক সঞ্জয় রায়ের ছেলে রাজ্যে নিজের পরিচিতি লাভ করেছেন একজন সাইক্লিস্ট ও অ্যাথলেট হিসেবে। যার কারণে তার প্রথম যাত্রাপথ ততটা বাধা বিঘ্নের মধ্যে অতিবাহিত হয়নি। আগরতলা থেকে প্রায় ১৩০০ কিলোমিটার পথ সাইকেল চালিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন নেপালে। সেখান থেকে দুর্গম রাস্তা পায়ে হেঁটে ও দৌড়ে ৬ এপ্রিল অরিত্র পৌঁছান কাপুল। কাপুলে পৌঁছে শুরু হয় রুটিন মেনে এক সপ্তাহের ট্র্যাকিং। ১৫ এপ্রিল প্রথমবার বেস ক্যাম্পে পা রাখেন অরিত্র। শুরু হয় এভারেস্ট জয়ের প্রথম পথচলা। নিয়ম নির্দেশিকা মেনে বেস ক্যাম্পে পৌঁছানোর পর এক নং ও দুই নং এভারেস্ট ক্যাম্প পর্যন্ত ঘুরে আসেন তিনি। যার মূল লক্ষ্য ছিল আবহাওয়া ও পরিবেশের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া। পাশাপাশি উচ্চতার নিরিখে শরীর ও মনকে পরিণত করতেই এই কাজটা ছিল জরুরি। রুটিন মেনে এই কাজ করার পর অবশেষে বেস ক্যাম্পে ফিরে এসে অনুকূল আবহাওয়ার জন্য প্রতীক্ষার পালা। এটাই এভারেস্টের অভিযানের আসল পর্ব।

শুরু হয় চূড়ান্ত প্রস্তুতি। লক্ষ্য একটাই, শুধু মাউন্ট এভারেস্ট জয়। ৫ মে বেস ক্যাম্পে ফিরে এসে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নেবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এদিকে, অভিযানের মূল শেরপা কর্মা ও অন্যান্য অভিযাত্রী দলের এভারেস্টের তুষার পরবর্তী শেষ করে নেয় গায়ে দড়ি বাঁধার কাজ। ১৭ মে বেস ক্যাম্পে খবর পৌঁছালো ১৮ মে থেকে ২১ মে পর্যন্ত এভারেস্টের শীর্ষ চূড়ার পৌঁছানোর সময়টুকু সবচেয়ে অনুকূল। বাতাসের গতি, বায়ুর চাপ, তাপমাত্রা সমস্ত তথ্য হাতে নিয়ে ১৪ মে থেকে শুরু হল অরিত্র রায়ের নতুন অভিযান।

প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী দিনের সূর্যের আলোতে বরফ গলে যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। ঘন ঘন হয় আইস ফল। যার কারণে অভিযাত্রীগণ শিখরে পৌঁছানোর কাজ সম্পন্ন করেন রাতে। শেরপাদের নির্দেশ মেনে অভিযাত্রী দলের নেতৃত্বে ও নির্দেশনায় ১৫ মে সকালে অরিত্রসহ প্রত্যেক অভিযাত্রীরা পৌঁছে যান এক নম্বর বেস ক্যাম্পে। রাতের আলোতে শুরু হয় দ্বিতীয় বেস ক্যাম্পের যাত্রা। ১৭ ও ১৮ মে পৌঁছান তৃতীয় ও চতুর্থ ক্যাম্পে। ২৬ হাজার ফুট উচ্চতার চার নং বেস ক্যাম্প ছিল সবচেয়ে বেশি বিপদসংকুল। এই ক্যাম্পের উপরের চূড়াকে বলা হয় ডেথ জোন। চার নং ক্যাম্প থেকে সামিট পয়েন্ট বাস চূড়ার অভিমুখের যাত্রা অনেকটাই কঠিন হয় এই অভিযানে। কঠিন পরিশ্রম আবার সামনে আসে ১৮ মে রাত আটটা থেকে ১৯ মে সকাল ৭টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। এটাই ছিল জীবনের সবচেয়ে কঠিনতম সময়। যত উপরের দিকে উঠেছেন, ততই একদিকে পরিলক্ষিত হয়েছে প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি। আর অন্যদিকে প্রতিকূলতা, ক্লান্তি ও অবসাদ। সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অবশেষে ২১ মে অরিত্র রায়ের জীবনে চলে এলো শুভ মহেন্দ্রক্ষণ। নতুন ভোরের নতুন সূর্যোদয়ের আগেই মাউন্ট এভারেস্টের ২৯, ০৩১ ফুট উচ্চতায় ভারতের জাতীয় পতাকা তুলে ধরলেন ছোট্ট ত্রিপুরার অরিত্র রায়। প্রথম পর্বত আরোহী হিসেবে ইতিহাসের পাতায় সোনালী অক্ষরে অরিত্র রায় লিখলেন নিজের নাম।

৬৪ দিনের এই এভারেস্ট যাত্রার পথে অনেক অভিজ্ঞতার সাক্ষী অরিত্র রায়। সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গে উঠার সময় ফিলিপিন্সের চারজন অভিযাত্রীর সদ্য মৃতদেহ যেমন তুষারের চাদরে পড়ে থাকতে দেখেছেন, ঠিক তেমনি মাউন্ট লুতশাহের চূড়া থেকে নামার সময় এভারেস্ট জয়ী রোমানিয়ার এক অভিযাত্রীকেও জীবন বিসর্জন দিতে দেখেছেন তিনি। হিমশীতল এইযাত্রা পথে মনোবলকে একত্রিত করে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছেন অরিত্র।

রাজ্যে পৌঁছানোর পর অভিনন্দন জোয়ারে ভাসছেন এভারেস্ট জয়ী রাজ্যের প্রথম পর্বতারোহী অরিত্র রায়। এভারেস্ট জয়ের আগে এ বছরেরই জানুয়ারি মাসে অরিত্র আফ্রিকা মহাদেশের উচ্চ গিরিশৃঙ্গ কিলি মানজারু জয় করেছেন। যে পর্বত শৃঙ্গের উচ্চতা ১৯,৩৪১ ফুট। শুধু আফ্রিকা নয় ইউরোপ মহাদেশের মাউন্ট এলভারসের শিখরেও পা রেখেছেন ত্রিপুরার অরিত্র রায়। দার্জিলিংয়ের হিমালয়ান মাউন্টিনয়ারিং ইনস্টিটিউটের ছাত্র অরিত্র রায়ের জীবনের মূল লক্ষ্য হলো পৃথিবীর পাঁচ মহাদেশের পাঁচ সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ জয় করা। যদিও ইতিমধ্যে দুটি গিরিশৃঙ্গ জয় করে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিয়েছেন অনেকটাই। তাই আগামীর বাকি তিনটি পর্বত শৃঙ্গ জয়ের পথ অনেকটাই সহজ সরল হবে অরিত্রের কাছে। অরিত্রর আবেদন— আগামীদিনে তিনটি গিরিশৃঙ্গ জয়ের অভিযানে সাফল্য পেতে প্রত্যেকে যেন তার জন্য প্রার্থনা করেন। পর্বতারোহের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার সোনালী ইতিহাস রচনা করতে চান অরিত্র রায়।

স্মার্ট মিটার সংক্রান্ত তথ্যাবলী

ভারত সরকার ও ত্রিপুরা সরকারের যৌথ উদ্যোগে সম্মানিত গ্রাহকদের বাড়িতে, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ও সরকারি কার্যালয়ে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্মার্ট মিটার বসানো হচ্ছে

স্মার্ট মিটার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর এবং গ্রাহক বান্ধব। এই মিটার ব্যবহারের ফলে অতিরিক্ত বিল আসার কোন আশঙ্কা নেই বরং এই মিটার ব্যবহারের ফলে বৈধ গ্রাহক অনেক বেশি সচেতন এবং অনেক বেশি সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

এই স্মার্ট মিটার ব্যবহারের ফলে একজন গ্রাহক মূলত যে সুবিধা গুলি ভোগ করতে পারবেনঃ

- বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বাড়িতে যেভাবে স্মার্ট মিটার বসানো হবে একইভাবে ঐ এলাকায় ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমারেও স্মার্ট মিটার বসানো হবে। এরফলে ওই এলাকায় ট্রান্সফরমারে কোন গোলযোগ হচ্ছে কিনা তা ওই স্মার্ট মিটার মারফত নিগমের কন্ট্রোল রুমে সরাসরি সংকেত চলে আসবে। এতে করে বিদ্যুৎ নিগম দ্রুত ওই ট্রান্সফর্মার সারাই করতে পারবে।
- সঠিক মিটার রিডিং এর ভিত্তিতে বিদ্যুৎ গ্রাহকের বাড়িতে যত ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার হবে স্মার্ট মিটারে তত ইউনিটেরই রিডিং আসবে। এতে বেশি কিংবা কম রিডিং কোনটাই হবে না, একদম সঠিক রিডিং আসবে।
- বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বাড়ির দরজা বন্ধ থাকার ফলে ডোর লক বিল কিংবা সারপ্রাইজ বিল অথবা আনুমানিক বিলের কোন সম্ভাবনা রইল না।
- স্মার্ট মিটারের মাধ্যমে গ্রাহকরা দৈনন্দিন বিদ্যুৎ ব্যবহারের তথ্য নিজের মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে কিংবা অনলাইন পোর্টালে দেখতে পারবেন।
- স্মার্ট মিটার ব্যবহারের ফলে গ্রাহকের বাড়িতে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের খবর অতি দ্রুত বিদ্যুৎ নিগমের কাছে পৌঁছে যাবে এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হবে।
- বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানো থাকলে সোলার কানেকশন এর ক্ষেত্রে আলাদা করে নেট মিটার লাগানোর আর প্রয়োজন পড়বে না। ওই স্মার্ট মিটারই নেট মিটারের কাজ করবে। যে কারণে সোলার কানেকশন নেওয়ার ক্ষেত্রে আনুমানিক ৫০০০ টাকা সাশ্রয় হয়ে যাবে।
- স্মার্ট মিটার নিয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ

নিগম লিমিটেডের প্রধান কার্যালয়ে এসে বিস্তারিত জানতে পারেন।

ডিজিটেল হোন, বিদ্যুৎ বিলে ৪% ছাড় পান

আপনার বাড়ির বিদ্যুৎ বিলিং তারিখ থেকে ৫ দিনের মধ্যে অনলাইনে/ডিজিটেল পদ্ধতিতে বিল প্রদান করে ৪% ছাড় উপভোগ করুন। ৫ দিনের মধ্যে নিগমের ক্যাশ কাউন্টার এসে বিল জমা দিলে ৩% ছাড় পাওয়া যায়।

মনে রাখবেন, বিলিং তারিখ থেকে ১৫ দিন পরে বিল পরিশোধ করলে আরও অতিরিক্ত ২% বিল পরিশোধ করতে হবে

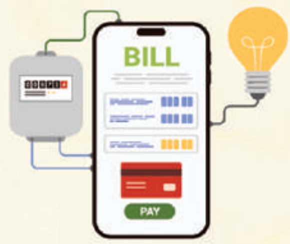

সোলার লাগান
বিদ্যুৎ বিল শূন্যে আনুন

আপনার বিদ্যুৎ বিল শূন্যে আনতে পারে

পি এম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা

সরকারি ভর্তুকিতে বাড়িতে সোলার প্যানেল বসিয়ে আপনার বিদ্যুৎ বিল শুধু শূন্য নয়, বিদ্যুৎ বিক্রি করে বাড়তি রোজগারও করতে পারেন। শুধুমাত্র আপনার পুরানো একটি বিদ্যুৎ বিল আর মোবাইল ফোন নিয়ে বিদ্যুৎ নিগমের নিকটবর্তী কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন। ফোন করতে পারেন ৬০৩৩১৩১৬৮১ নম্বরে। ভিজিট করতে পারেন https://www.pmsuryaghar.gov.in

যেকোনো তথ্যের জন্য বিদ্যুৎ নিগমের টোল ফ্রি নম্বর ১৯১২ কিংবা www.tsecl.in দেখতে পারেন

ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত

EXPLORE TRIPURA

Tripura Tourism Development Corporation Ltd.

Swetmahal, Agartala,
Phn- 0381 232 5930

www.tripuratourism.gov.in